ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও নিজের বালতিটি থেকে আপন ভাইয়ের পাত্র ভরে দেওয়ার উল্লেখ কেবল উদাহরণ হিসাবেই করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কেবল এই যে, নিজের ভাইয়ের যতটুকু খেদমত ও সাহায্য তুমি করতে পার এবং তাকে যতটুকু আরাম দিতে পার, এতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এগুলো সবই সদাচরণ ও পরোপকারের অন্তর্ভুক্ত।

আজ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তাহলে সমাজে কেমন ভালবাসার পরিবেশ ও ভ্রাতৃত্বের ভাব সৃষ্টি হবে। এ হাদীসগুলো দ্বারা একথাও জানা গেল যে, কারো প্রতি সদাচরণ করা ও তার উপকার করা ধনী হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এ মর্যাদা লাভে গরীবরা নিজেদের দরিদ্রতা সত্ত্বেও ধনীদের সাথে অংশীদার হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশের মূল্য দেওয়ার এবং এ থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন।

অন্যকে অগ্রাধিকার দান

এহসান ও অন্যের হিতকামনার একটি উঁচু স্তর হচ্ছে এই যে, কারো একটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন থাকে, কিন্তু অন্য কোন প্রার্থী যদি সামনে এসে যায়, তাহলে সে এটা তাকে দিয়ে দেয় এবং নিজে কষ্ট স্বীকার করে নেয়। এটাকেই "ঈসার" তথা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দান বলে। নিঃসন্দেহে মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে এর অবস্থান সর্বশীর্ষে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের জীবনধারা এটাই ছিল এবং তিনি অন্যদেরকেও এর শিক্ষা ও এর প্রতি উৎসাহ দান করতেন।

(١٣٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُوْكَ هٰذِهِ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَاٰهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ فَاكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ اَصْحَابُهُ قَالَ مَا اَحْسَنْتَ حِيْنَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لَايُسْاَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّيْ اُكَفَّنُ فِيْهَا * (رواه البخارى)

১৩৩। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর (হাদিয়া দেওয়ার জন্য) নিয়ে আসল এবং নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ চাদরটি আপনাকে পরিধান করাতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরটি গ্রহণ করে গায়ে দিলেন। আর তখন তাঁর এমন একটি চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তিনি যখন এটা গায়ে দিলেন, তখন তাঁর সহচরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরটি তো খুবই সুন্দর! এটা আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। (এই বলে তিনি চাদরটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন তাঁর সাথীরা তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তুমি কাজটি ভাল করলে না। তুমি তো দেখছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের মুহূর্তে চাদরটি গ্রহণ করেছেন। তারপরও তুমি এটা চেয়ে বসলে, অথচ তুমি জান যে, তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়েই দেন। ঐ সাহাবী তখন উত্তরে বললেন, আমি তো কেবল এর বরকতের আশা করেছি। কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে পরিধান করেছেন। এখন আমার আশা যে, এটাই আমার কাফন হবে। —বুখারী

(١٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ ،وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُضَيِّفُهُ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْطَلْحَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى رَحْلِهٖ فَقَالَ لِاِمْرَأَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَىْءٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى بِيَدِهٖ لِيَاْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ كَىْ تُصْلِحِيْهِ فَاَطْفِئِيْهِ فَفَعَلَتْ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْ ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, আমি ক্ষুধায় কাতর এক গরীব মানুষ। একথা শুনে তিনি তাঁর জনৈকা স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠালেন (যে, ঘরে খাওয়ার মত কোন জিনিস থাকলে এর জন্য পাঠিয়ে দাও।) সেখান থেকে উত্তর আসল যে, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে এ মুহূর্তে পানি ছাড়া অন্য কোন কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর ঘরে খবর পাঠালেন। সেখান থেকেও এই উত্তর আসল। তারপর (এভাবে প্রত্যেক ঘরেই তিনি একথা বলে পাঠালেন এবং) সবার পক্ষ থেকে একই উত্তর আসল। এবার তিনি সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ লোকটির মেহমানদারী করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন। একথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে আবূ তালহা নামক এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি (একজন মেহমানকে খাওয়ানোর মত) কিছু আছে ? স্ত্রী উত্তর দিল, কেবল শিশুদের আহারের জন্য কিছু খাবার আছে, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। (এমনকি আপনার এবং আমার খাওয়ার জন্যও কিছু নেই।) আবূ তালহা বললেন, তুমি শিশুদেরকে কোন কিছু দিয়ে মনোরঞ্জন করে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর মেহমান যখন

ঘরে আসবে, তখন এ ভাব দেখাও যে, আমরাও তার সাথে খানা খাব। তারপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে (এবং খানা শুরু করে দেবে) তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় উঠে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। (যাতে ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এবং মেহমান বুঝতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খানায় শরীক আছি কিনা।) কথামত স্ত্রী তাই করল এবং খাবারে বসলেন তো সবাই, কিন্তু খাবার কেবল মেহমানই খেয়ে গেল। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ক্ষুধা নিয়েই রাত কাটিয়ে দিল। প্রভাত হলে আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার এবং তার স্ত্রীর নাম নিয়ে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর অমুক বান্দা ও অমুক বান্দীর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে এবং তিনি খুবই খুশী হয়েছেন।

এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার খুশী বুঝানোর জন্য এখানে "আল্লাহ্ বিস্মিত হয়েছেন" শব্দ বলেছেন, না "আল্লাহ্ হেসেছেন" শব্দ বলেছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও বাস্তব কর্মনীতি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে গুণ ও মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল, এ ঘটনাটি তারই একটি নমুনা ও উদাহরণ। কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার সাহাবাদের এ গুণ ও এ চরিত্রের প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে ঃ তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (সূরা হাশর)

আবূ তালহা আনসারীর এ কাজটির অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও অভাবনীয় মূল্যায়নের বিষয়টি বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রূপক অর্থে "আল্লাহ্ বিস্মিত হয়েছেন" অথবা "আল্লাহ্ হেসেছেন" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় একথা স্পষ্ট যে, 'বিস্মিত হওয়া' এবং 'হাসা' প্রকৃত অর্থ বিবেচনায় কেবল কোন বান্দারই গুণ হতে পারে।

প্রীতি-ভালবাসা এবং সম্পর্কহীনতা ও শত্রুতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রীতি-ভালবাসাকেও ঈমানের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। আর কেনই বা হবে না ? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে প্রীতি ও ভালবাসার মহান প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আর তাঁর প্রতিটি স্বভাব নিঃসন্দেহে ঈমানী স্বভাব।

(١٣٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَاْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَاْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে প্রীতি-ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন বান্দা প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, সে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসবে এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসবে এবং আপন মনে করবে। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ না থাকে, তাহলে তার মধ্যে যেন কোন কল্যাণ নেই।

কেননা, সে অন্যের কোন উপকারে আসবে না এবং অন্যরাও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

এ হাদীসে ঐসব নীরস ও শুষ্ক মেযাজের লোকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে, যারা সব মানুষ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকাকেই দ্বীনের দাবী মনে করে এবং এ জন্য তারা নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং অন্যদেরকেও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেয় না। তবে মু'মিনের এ প্রীতি-ভালবাসা ও অন্যের প্রতি টান ও আকর্ষণ এবং অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা এসব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর বিধি-বিধানের আওতায় হওয়া চাই।

আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা

(١٣٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ * (رواه ابوداؤد)

১৩৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে ঐ ভালবাসা, যা আল্লাহ্‌র জন্য হয় এবং ঐ শত্রুতা, যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয়। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষের এ অবস্থা হয়ে যাওয়া যে, সে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্‌র জন্যই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এটা ঈমানের এক উঁচু স্তর। কিতাবুল ঈমানেও এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গেফারীকে বলেছিলেন ঃ ঈমানের সবচেয়ে মজবুত দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, আর আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিদান ও এবাদত বিশেষ

(١٣٧) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ * (رواه احمد)

১৩৭। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য অপর কোন বান্দাকে ভালবাসা দান করল, সে আসলে নিজের মহান প্রতিপালকের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করল। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, কোন বান্দার অন্য কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে ভালবাসা পোষণ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র উচ্চ মর্যাদার দাবী পূরণ করারই নামান্তর। আর এ হিসাবে এটা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতের মধ্যেই গণ্য।

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপনকারীরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে যায়

(١٣٨) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ * (رواه مالك)

১৩৮। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার ভালবাসা অবধারিত ঐসব লোকের জন্য, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, আমার কারণে কোথাও একসাথে বসে, আমার কারণে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং আমার কারণে একজন অন্য জনের জন্য খরচ করে। —মুয়াত্তা মালেক

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র যে সব বান্দা নিজেদের ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার অধীন করে দিয়েছে এবং যাদের অবস্থা এই যে, তারা কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসে, কারো কাছে বসলে আল্লাহ্র জন্যই বসে, কারো সাথে সাক্ষাত করলে আল্লাহ্র জন্যই সাক্ষাত করে এবং কারো উপর অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ্র জন্যই ব্যয় করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র এসব বান্দা এর উপযুক্ত যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সন্তুষ্টি ও ভালবাসার অধিকারী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলার এ সুসংবাদের ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার ঐসব বান্দার প্রতি আমার ভালবাসা অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি তাদেরকে ভালবাসি, আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আমার প্রিয়পাত্র।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এসকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ *

(رواه مسلم)

১৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হল— যে অন্য এক জনপদে বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার চলার পথে এক ফেরেশ্তাকে অপেক্ষমান বানিয়ে বসিয়ে রাখলেন। (ঐ ব্যক্তি যখন এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন) ঐ ফেরেশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা ? সে উত্তরে বলল, আমি এ জনপদে বসবাসকারী এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফেরেশ্তা জিজ্ঞাসা করল, তোমার উপর কি তার এমন কোন অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান দিতে তুমি যাচ্ছ ? সে বলল, না। আমার সেখানে যাওয়ার কারণ কেবল এই যে, আমি তাকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসি। ফেরেশ্তা বলল, আমি তোমাকে বলছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার নিকট একথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তাঁর জন্য ঐ বান্দাকে ভালবাস। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, বাহ্যতঃ এটা পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কারো ঘটনা। এ ঘটনা দ্বারা একথাও জানা গেল যে, কোন কোন সময় ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র নির্দেশে নবী ছাড়া অন্য কারো কাছেও আসতে পারেন

এবং তার সাথে সামনাসামনি এ ধরনের কথাও বলতে পারেন। হযরত মারইয়াম সিদ্দীকার কাছে আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর আগমন ও তাঁর সাথে কথোপকথনের বিষয়টি কুরআন মজীদেও উল্লেখিত রয়েছে। অথচ এটা জানা কথা যে, হযরত মারইয়াম নবী ছিলেন না।

এ ঘটনার আসল প্রাণবস্তু এবং এর বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বাস্তব বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দার তার ভাইয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা পোষণ করা এবং এ ভালবাসার দাবীতে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া এমন পুণ্য কর্ম যে, এ কাজ তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বানিয়ে দেয়। এমনকি কখনো কখনো এমন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বিশেষ ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে তাকে নিজের ভালবাসার সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেন। আহ্! তারা কত ভাগ্যবান! তাদের জন্য কি বিরাট সুসংবাদ।

আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা পোষণকারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা

(١٤٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَاهُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَاَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَا يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * (رواه ابوداؤد)

১৪০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন ভাগ্যবান বান্দা রয়েছে, যারা নবী অথবা শহীদ তো নয়, কিন্তু কেয়ামতের দিন অনেক নবী ও শহীদ তাদের নৈকট্যের কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলবেন কি, তারা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা কোন আত্মীয়তা ছাড়াই এবং অর্থ-সম্পদের লেনদেন ছাড়াই কেবল আল্লাহ্‌র রূহের কারণে একে অপরকে ভালবেসেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল; বরং আলোর মেলা। আর তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। সাধারণ লোকজন যখন ভীত বিহ্বল থাকবে, তখন তারা থাকবে নির্ভয়-নিশ্চিন্ত। অন্যরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, তখন তারা থাকবে দুশ্চিন্তামুক্ত। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই ঃ মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ায় রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে কারো সাথে ভালবাসা ও সুসম্পর্কের সৃষ্টি হওয়া এমন একটি সাধারণ ও প্রকৃতিগত বিষয়, যা মানুষ ছাড়া সাধারণ পশু-এমনকি হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, তাকে হাদিয়া-তোহ্‌ফা দেয়, তাহলে তার মধ্যে ঐ সুহৃদ ও উপকারী ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও এমন একটি সহজাত বিষয়, যা কাফের, মুশরিক ও ফাসেক-

পাপাচারীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রক্তের বন্ধন ও আত্মীয়তা ছাড়া এবং কোন আর্থিক আদান-প্রদান এবং হাদিয়া তোহ্‌ফা ছাড়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে কাউকে ভালবাসা এমন একটি গুণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যার বিরাট মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। এর কারণে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র ও খুবই নৈকট্যশীল হয়ে যায় এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর এমন অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, নবী-রাসূল এবং শহীদগণও তার উপর ঈর্ষা করবেন।

তবে এর অর্থ এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, এসব লোক মর্তবা ও মর্যাদার দিক দিয়ে নবী-রাসূল ও শহীদদের চাইতে উত্তম ও উন্নত স্তরের অধিকারী হবে। কোন সময় এমনও হয় যে, নিম্নস্তরের কোন মানুষকে বিশেষ কোন অবস্থানে দেখে তার চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষের মধ্যেও ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিষয়টি যুক্তি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হলেও বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এখানে যা বলা হয়েছে, এটা জোরপূর্বক কোন ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং এক বাস্তব সত্য।

এখানে যেসব বান্দার নৈকট্যের স্তর দেখে নবী-রাসূল এবং শহীদগণের ঈর্ষান্বিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় হাদীসে এ শব্দমালায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র রূহের কারণে একে অপরকে ভালবাসে। এখানে রূহ শব্দটি "রা" অক্ষরে পেশ দিয়ে "রূহ" ও পড়া যায় এবং যবর দিয়ে "রাওহ"ও পড়া যায়। আমাদের দৃষ্টিতে উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দ্বীন। আর অর্থ এই হবে যে, এরা আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দা, যারা এ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে একে অপরকে ভালবাসা দান করেছে। দ্বীন প্রকৃতপক্ষে পরকালীন জীবনের জন্য রূহতুল্য যা আসল জীবন। আর নিঃসন্দেহে দ্বীন আল্লাহ্‌র বিশেষ নেয়ামত ও রহ্‌মত। আর "রাওহ" শব্দের অর্থ নেয়ামত, রহ্‌মত ও শান্তি। সারকথা, এখানে "রূহ" এবং"রাওহ" যাই পড়া হোক, অর্থ একই থাকবে।

হাদীসের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ এ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, কেয়ামতের দিন যখন সাধারণ মানুষের উপর ভয় এবং দুশ্চিন্তার তুফান চলবে, তখন তাদের অন্তরে ভয় ও আশংকার কোন লেশও থাকবে না; বরং তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে স্বস্তি ও আনন্দে ডুবে থাকবে।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ভালবাসা স্থাপনকারীরা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে

(١٤١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ * (رواه مسلم)

১৪১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ আমার ঐ বান্দারা কোথায়, যারা আমার মাহাত্ম্যের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত ? আজ যখন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই, তখন আমি ঐ বান্দাদেরকে নিজের ছায়ার মধ্যে স্থান দেব। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং সবকিছুই দেখেন। বিশ্ব জগতের কোন অণু পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই। তাই কেয়ামতের দিন তিনি যে বলবেন, আমার ঐসব বান্দা কোথায় ? এটা আসলে প্রশ্ন হিসাবে এবং জানার জন্য হবে না; বরং হাশরের ময়দানে সকল সৃষ্টির সামনে এ আহ্বান এ উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হবে, যাতে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে তাদের মর্যাদা ফুটে উঠে। তারা যেন শুনে নেয় এবং দেখে নেয় যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা ও অবস্থান কোথায়।

এ হাদীসে উল্লেখিত "আল্লাহ্র ছায়া" দ্বারা সম্ভবতঃ আল্লাহ্র আরশের ছায়া উদ্দেশ্য। যেমন, কোন কোন হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ভালবাসা নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের উপায়

(١٤٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের সঙ্গী হতে পারেনি ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ যে যাকে ভালবাসে সে তারই সাথী হয়ে থাকবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ একথা জিজ্ঞাসা করা ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন বিশেষ পুণ্যবান মুত্তাকী বান্দাকে অথবা এ ধরনের কোন দল ও গোষ্ঠীকে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে কর্ম ও চরিত্রে ঠিক তাদের সমান ও তাদের স্তরে উন্নীত নয়; বরং তাদের চেয়ে কিছুটা পেছনে, এমন ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ? এ ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারকথা এই হবে যে, এ ব্যক্তি আমল ও কর্মে কিছুটা পেছনে থাকলেও তাকে ঐ বান্দাদের সাথে শামিল করে দেওয়া হবে, যাদের সাথে আল্লাহ্র জন্য এবং দ্বীনের খাতিরে তার ভালবাসা ছিল। সামনে হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নের শব্দমালা আরো অধিক স্পষ্ট।

(١٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاَعَادَهَا اَبُوْ ذَرٍّ فَاَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (رواه ابوداؤد)

১৪৩। আব্দুল্লাহ ইবনে সামেত সূত্রে হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন মানুষ আল্লাহ্র প্রিয় কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের মত আমল করতে

পারে না। (তাই এ ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। আবূ যর বললেন, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছেই এবং তাদের সাথেই থাকবে, যাদেরকে তুমি ভালবাস। একথা শুনে আবূ যর তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। —আবূ দাউদ

(١٤٤) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ فَرْحَهُمْ بِهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৪। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন ঃ আক্ষেপ তোমার উপর! (তুমি কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ, আগে বল তো,) তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? ঐ ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি এর জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতি তো গ্রহণ করি নাই, (যা আপনার সামনে উল্লেখ করার মত এবং আমার জন্য আশাব্যঞ্জক।) তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস, তারই সান্নিধ্যে থাকবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন ঃ আমি মুসলমানদেরকে (সাহাবায়ে কেরামকে) ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি, যতটুকু আনন্দিত হতে দেখেছি এ সুসংবাদ দ্বারা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনাধারায় হযরত আনাস (রাঃ)-এর বক্তব্যের শেষাংশ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে ঃ আমরা কখনো কোন ব্যাপারে এত আনন্দ লাভ করিনি, যতটুকু আনন্দ লাভ করেছিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায়, "তুমি তারই সান্নিধ্যে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস।" অতএব, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)কে ভালবাসি এবং এ আশা পোষণ করি যে, তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সান্নিধ্যে স্থান পাব, যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে পারিনি।

ভালবাসার কারণে প্রিয়পাত্রদের সান্নিধ্য লাভের অর্থ

কারো সাথী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ভালবাসার কারণে— যে ভালবাসে এবং যাকে ভালবাসা দেওয়া হয়— তারা উভয়েই স্তর ও মর্যাদায় সম্পূর্ণ এক হয়ে যাবে এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা হবে; বরং এখানে সাথী হওয়ার অর্থ নিজ নিজ স্তর ও পদমর্যাদায় এক সাথে থাকা। যেমন, এ দুনিয়াতেও খাদেম তার মনিবের সাথে এবং অনুগামী তার অনুসরণীয় ব্যক্তির সাথে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এটাও বিরাট মর্যাদা ও সৌভাগ্যের কথা।

ভালবাসার জন্য আনুগত্য জরুরী

আরেকটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভালবাসার জন্য আনুগত্য একান্ত জরুরী। এটা অসম্ভব কথা যে, কারো অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালাবাসা থাকবে আর তার জীবন হবে

অবাধ্যতা ও পাপাচারের। অতএব, যেসব লোক বল্গাহীনভাবে এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কাম ও বিধি-বিধান লংঘন করে, তারা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার দাবী করে, তাহলে তারা মিথ্যাবাদী। আর তারা যদি বাস্তবেও নিজেদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের আশেক ও প্রেমিক মনে করে, তাহলে মনে করতে হবে যে, তারা আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার।

হযরত রাবেয়া বসরী এ ধরনের ভালবাসার দাবীদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন ঃ হে ভালবাসার মিথ্যা দাবীদার! তুমি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে যাচ্ছ, অথচ তাঁর ভালবাসার দাবী করছ। জ্ঞান ও যুক্তির বিবেচনায় এটা খুবই আশ্চর্য বিষয়। তোমার মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা থাকলে তুমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কথা অবশ্যই মেনে চলে।

যাহোক, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার জন্য তাঁদের আনুগত্য একান্ত জরুরী; বরং সত্য কথা এই যে, পূর্ণ আনুগত্য ভালবাসা থেকেই সৃষ্টি হয়। ফারসী কবি বলেন ঃ প্রেম আসলে কি ? তুমি বলে দাও যে, প্রেম হচ্ছে প্রেমাস্পদের গোলাম হয়ে যাওয়া।

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের সাথী হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯)

অতএব, এ আয়াত ও উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু একই। শুধু শিরোনাম ও অবতারণার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এ বিষয়টি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঐ হাদীস দ্বারা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়, যা আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে নিজ তফসীরগ্রন্থে ইবনে মারদুবিয়া এবং তাবারানীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সারসংক্ষেপ এই ঃ এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার অন্তরে নিজ স্ত্রী, নিজের সন্তানাদি এবং নিজের জীবনের চাইতেও অধিক ভালবাসা রয়েছে। আমার অবস্থা এই যে, যখন আমি বাড়ীতে থাকি এবং আপনার কথা মনে পড়ে, তখন আপনাকে এক নজর না দেখা পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। আমি যখন আমার মৃত্যুর কথা এবং আপনার ওফাতের কথা চিন্তা করি, তখন এ কথাই আমার বুঝে আসে যে, ওফাতের পরে আপনি তো জান্নাতে গিয়ে নবী-রাসূলদের সুউচ্চ মকামে পৌঁছে যাবেন। আর আমি যদি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতেও যাই, তবুও তো আমি ঐ উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারব না। তাই আখেরাতে সম্ভবতঃ আপনার দীদার ও দর্শন থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এরই মধ্যে সূরা নিসার এ আয়াতটি নাযিল হল। এ আয়াতটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খাঁটি প্রেমিককে এবং অন্যান্য সকল প্রেমোৎসর্গকারী বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিল যে, তোমার মধ্যে যেহেতু সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে, তাই তুমি অবশ্যই আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হয়ে থাকবে। তারপর তুমি জান্নাতেও আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

যেহেতু প্রেম ও ভালবাসার ব্যাপারে অনেকেই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে যায় এবং অজ্ঞতা অথবা গভীর চিন্তা-ভাবনা না করার দরুন অনেকেই ভালবাসা ও আনুগত্যের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তা এড়িয়ে যায়, এ জন্য এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করে এর প্রয়াস পেয়েছি।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার রাসূলের ভালবাসা দান কর। আর যাদের ভালবাসা তোমার নিকট আমাদের জন্য উপকারী হবে, ঐসব বান্দাদের ভালাবাসাও আমাদেরকে দান কর।

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন রাহমাতুল লিল আলামীন, আর তাঁর শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত জগতের জন্য রহ্মতের ঝর্ণাধারা। তিনি নিজের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া ও সদাচরণের যে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন, এগুলোর মধ্য থেকে কিছু উপদেশমালা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী উম্মতকে যেহেতু আল্লাহ্র নির্দেশে ধর্মীয় বন্ধনের কারণে একটি বৃহৎ পরিবার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ পরিবারকেই নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন উম্মতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সদস্যবর্গ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহ্র জন্য আন্তরিক ভালবাসা, অকৃত্তিম সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মাধ্যমে একাত্ম হয়ে থাকবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষায় এ বিষয়টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস তো সামাজিক রীতি-নীতি অধ্যায়ে আসবে। তবে দু'একটি হাদীস এখানে "আখলাক ও নৈতিকতা" অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ করে দেওয়া উপযোগী মনে করছি।

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ভালবাসা ও আন্তরিকতা থাকা চাই

(١٤٥) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৫। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি মু'মিনদেরকে তাদের পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহে, ভালবাসায় এবং সহানুভূতিতে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের একটি অঙ্গে যখন অসুস্থতা বোধ হয়, তখন সারাটি দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উক্ত হাদীসের মর্ম এই যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী উম্মতের মধ্যে পরস্পর এমন ভালবাসা, এমন সহানুভূতি ও এমন আন্তরিক সম্পর্ক থাকা চাই যে, প্রতিটি দর্শনকারী চোখ তাদেরকে এ অবস্থায় দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়ে গেলে সবাই এটাকে নিজের বিপদ মনে করে এবং সবাই তার চিন্তা ও অস্থিরতায় অংশীদার হয়ে

যায়। যদি ঈমানের দাবী সত্ত্বেও কারো অন্তরে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ঈমান এখনও লাভ হয়নি। কুরআন মজীদে মু'মিনদের এ গুণটির কথা নিম্নোক্ত শব্দমালায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, "তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"

(١٤٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৬। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় রাখে। তারপর তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন (এবং দেখিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদেরকে এভাবে মিলেমিশে এমন সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে যাওয়া চাই, যার ইটগুলো পরস্পর লাগালাগি এবং একটি অপরটির সাথে এমনভাবে মিলিত যে, মাঝে কোন ফাঁক নেই।) —বুখারী, মুসলিম

পরস্পর ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুধারণা ও অন্যের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার নিষিদ্ধতা

উপরের হাদীসগুলোতে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে এবং একদেহ ও একপ্রাণ হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে এর বিপরীত আচরণ যেমন, পরস্পর কুধারণা পোষণ, কটুবাক্য বিনিময়, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, কারো বিপদে আনন্দিত হওয়া, কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির কঠোর নিন্দাবাদ এবং অত্যন্ত তাকীদের সাথে এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(١٤٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের ব্যাপারে কুধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা, কুধারণা হচ্ছে বড় মিথ্যাচার। আর তোমরা কারো দুর্বলতা ও দোষের অনুসন্ধান করতে যেয়ো না, অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না এবং একজন অন্যজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেসব জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে ঐসব বিষয় যেগুলো অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে দেয়। সর্বপ্রথম এখানে তিনি কুধারণার উল্লেখ করেছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে একটা মিথ্যা অনুমান। যে ব্যক্তি এ

রোগে আক্রান্ত হয়, তার অবস্থা এই হয় যে, যার সাথেই তার সামান্য মতবিরোধ দেখা দেয়, তার প্রতিটি কাজেই সে অসৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তারপর কেবল এ মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে সে তার প্রতি এমন সব বিষয় সম্পৃক্ত করে দেয়, যেগুলো আসলে অবাস্তব তারপর অনিবার্যভাবেই বাহ্যিক আচরণেও এর প্রভাব পড়ে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবে উভয়ের অন্তর সাংঘাতিকভাবে আহত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুধারণাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যতঃ এর অর্থ এই যে, কারো বিরুদ্ধে মুখে মিথ্যা উচ্চারণ করলে এটা যে মস্ত বড় পাপ, একথা প্রত্যেক মুসলমানই জানে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করাকে এমন খারাপ মনে করা হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কুধারণাও বড়, বরং সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার এবং অন্তরের এ গুনাহ্ মুখের গুনাহ্র চেয়ে কম নয়।

এ হাদীসে যেভাবে কুধারণাকে জঘন্য পাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অন্য এক হাদীসে সুধারণাকে উত্তম এবাদত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ "সুধারণা উত্তম এবাদতের মধ্যে গণ্য।" —মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ বর্ণনা ঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

কুধারণার পর এ হাদীসে আরো কতিপয় বদভ্যাস ও মন্দ স্বভাব থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কারো দুর্বলতার পেছনে লেগে থাকা, অন্যদের দোষ অনুসন্ধান করা, একে অন্যের উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা, কাউকে ভাল অবস্থায় দেখে তার উপর হিংসা করা ও শীতল চোখে কারো সুখ-শান্তি দেখতে না পারা ইত্যাদি। এ মন্দ স্বভাবগুলোর অবস্থাও এই যে, এগুলোর দ্বারা পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ অংকুরিত হয় এবং ঈমানী সম্পর্ক যে ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য কামনা করে, এগুলো এ সম্ভাবনাকেও তিরোহিত করে দেয়।

হাদীসের শেষাংশে যে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে থাক," এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেদের অন্তর থেকে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টিকারী এ বদভ্যাসগুলো দূর করতে পারবে, তখনই কেবল তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারবে।

(١٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَايَخْذُلُهٗ وَلَا يُحَقِّرُهٗ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا — وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ — بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُّحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ * (رواه مسلم)

১৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর অবিচার করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে রাখবে না, তাকে অপমান করবে না এবং তাকে ছোট মনে করবে না।

(কে জানে, তার অন্তরে হয়তো তাক্ওয়া ও খোদাভীতি রয়েছে এবং এ কারণে সে আল্লাহ্র নিকট সম্মানের পাত্র।) তারপর তিনি তিনবার নিজের বক্ষঃস্থলের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তাক্ওয়া এখানে থাকে। (হতে পারে যে, তুমি কাউকে তার বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে অতি সাধারণ মানুষ মনে কর, অথচ নিজের অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে সে আল্লাহ্র কাছে অসাধারণ সম্মানের অধিকারী। তাই কখনো কোন মুসলমানকে ছোট মনে করো না।) একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম পবিত্র ও সম্মানিত বস্তু। (এ জন্য অন্যায়ভাবে তার রক্তপাত, সম্পদ আত্মসাৎ ও সম্ভ্রমহানি করা হারাম।) —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের একটি হক এই বলা হয়েছে যে, সে যখন তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাকে সাহায্য করতে হবে। তবে এটা তখনই করতে হবে, যখন সে ন্যায়ের উপর থাকে এবং নির্যাতিত হয়। অত্যাচারী হলে তাকে সাহায্য করা যাবে না।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমার মুসলমান ভাই যদি নির্যাতিত হয়, তাহলে তাকে সাহায্য কর। আর জালেম হলে জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখ। তাকে এ জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।

ঈমানদার বান্দাদেরকে উৎপীড়নকারী ও অপমানকারীদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী

(١٤٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهٖ * (رواه الترمذى)

১৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ হে ঐসব লোকজন, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অথচ অন্তরের গভীরে এখনো ঈমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, আল্লাহ্র নীতি হচ্ছে এই যে, যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্ তার গোপন দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অন্বেষণ করবেন, তাকে তিনি অবশ্যই অপমান করে ছাড়বেন— যদি সে তার ঘরের ভিতর লুক্কায়িতও থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কারো অন্তরে যখন প্রকৃত ঈমান স্থান করে নেয়, তখন এর স্বাভাবিক ফল এ হয় যে, সে নিজের পরিণতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার এবং বান্দার হক সম্পর্কে খুবই সচেতন ও সতর্ক হয়ে যায়। বিশেষ করে আল্লাহ্র যেসব বান্দা খাঁটি ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তাদের ব্যাপারে সে আরো বেশী সতর্ক থাকে। তাদেরকে উৎপীড়ন করতে তাদের অন্তরে আঘাত দিতে, তাদের গোপন দোষ

আলোচনা করতে, তাদেরকে লজ্জা দিতে এবং তাদের জীবনের দুর্বল দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে সে সতর্কতার সাথে বিরত থাকে। কিন্তু অন্তরে যদি ঈমানের স্বরূপ প্রবেশ না করে থাকে এবং মুখেই শুধু ইসলামের দাবী করা হয়, তাহলে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত দেখা যায়। সে নিজের চিন্তার পরিবর্তে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ায়। বিশেষ করে সে আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দার পেছনে লেগে যায়, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ঈমান ও দাসত্বসূলভ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়ে থাকে। সে তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করে, তাদের দোষত্রুটি প্রচার করে বেড়ায় এবং তাদেরকে বদনাম ও অপমান করতে চায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এসব লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন এ আচরণ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের বদনাম করা এবং তাদের সম্ভ্রমহানি ও গোপন দোষ অনুসন্ধানের নেশা ত্যাগ করে। অন্যথায় আখেরাতের বিচারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। তারা যদি অপমান থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘরের ভিতরেও লুকিয়ে থাকে, তবুও এ চার দেয়ালের ভিতরেই আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। ফারসী কবি বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন কাউকে অপমান করতে চান, তখন তার অন্তর পুণ্যবানদের সমালোচনার দিকে যায়।

হিংসা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী

(١٥٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ * (رواه ابوداؤد)

১৫০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা-রোগ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমলসমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতাও সাক্ষী যে, যার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে, সে এর পেছনেই লেগে থাকে যে, যার প্রতি তার হিংসা, তার কিভাবে ক্ষতি করা যায় এবং তাকে কিভাবে অপমান করা যায়। তারপর সে যদি কিছু করতে না পারে, তাহলে তার গীবত করেই মনের আগুন নিভাতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এর ন্যূনতম ফল এই হবে যে, কেয়ামতের দিন এ হিংসুক গীবতকারীর পুণ্যসমূহ ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে, যার গীবত সে করেছিল। "হিংসা পুণ্যসমূহ খেয়ে ফেলে" এর সহজ ব্যাখ্যা এটাই।

(١٥١) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ * (رواه احمد والترمذى)

১৫১। হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মারাত্মক ব্যাধি অর্থাৎ, হিংসা ও শত্রুতা তোমাদের দিকে সংক্রমিত হয়ে চলে আসছে। আর এটা হচ্ছে মুন্ডনকারী। (তারপর নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট

করতে গিয়ে বললেন ঃ) আমার এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এটা মাথার চুল মুন্ডন করে; বরং এটা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করে ফেলে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ্‌র এ সাক্ষ্য কুরআন মজীদে সংরক্ষিত রয়েছে যে, "তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল"। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে এক করে দিয়েছেন এবং এর ফলে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছে। (সূরা আলে ইমরান)

অন্য এক আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবীদের অন্তর মিলিয়ে দিয়েছেন এবং অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। আপনি যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ ও উপকরণ এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে এমন প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। (সূরা আনফাল)

কুরআন মজীদের এ স্পষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতিতে ভরে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষের নাম-গন্ধও ছিল না। তাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হতে পারে যে, (সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নয়; বরং) পরবর্তী যুগসমূহে হিংসা ও শত্রুতার যে মারাত্মক রোগ মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে আসবে, সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই তিনি উম্মতকে এ আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, হিংসা-বিদ্বেষের যে সর্বনাশা ব্যাধি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের অনেকের দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করে দিয়েছিল, সেই ব্যাধি এ উম্মতের দিকেও আসছে। তাই আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন সাবধান থাকে এবং এ অভিশাপ থেকে নিজেদের অন্তরকে রক্ষা করার চিন্তা করে।

হিংসা-বিদ্বেষের অশুভ পরিণতি

(١٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا * (رواه مسلم)

১৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন— সোমবার ও বৃহস্পতিবার সমস্ত মানুষের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে ঐ দু' বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এ দু'জনকে বাদ রাখ, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমার সিদ্ধান্ত লিখো না,) যে পর্যন্ত না তারা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে ফিরে আসে এবং অন্তর পরিষ্কার করে নেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য এক হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা ইমাম মুনযিরী (রহঃ) "তারগীব ও তারহীব" গ্রন্থে তাবারানীর "আওসাত" গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে

পেশ করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে থাকে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং যে তওবা করে নিয়ে থাকে তার তওবা কবূল করা হয়। কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারীদের আমল তাদের বিদ্বেষের কারণে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমা ও তওবা কবূলের ফায়সালা করা হয় না।) যে পর্যন্ত তারা এ বিদ্বেষ থেকে ফিরে না আসে।

এ বিষয়ের আরো কিছু হাদীস রয়েছে। এর সবগুলো থেকে একথাই জানা যায় যে, যে মুসলমানের অন্তরে অন্য মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে, সে যে পর্যন্ত এ ব্যাধি থেকে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করে না নেবে, সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত ও ক্ষমার যোগ্য হবে না।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না।

কারো দুঃখে আনন্দিত হওয়ার শাস্তি

(١٥٣) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِاَخِيْكَ فَيُعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ * (رواه الترمذى)

১৫৩। হযরত ওয়াছেলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। (এমন করলে হতে পারে যে,) আল্লাহ্ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন আর তোমাকে বিপদে ফেলে দেবেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং এটা উন্নতি করতে করতে শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন এমন অবস্থাও হয় যে, একজন বিপদে পড়লে অন্যজন খুশী হয়। এটাকেই "শামাতাত" তথা "অন্যের দুঃখে উল্লসিত হওয়া" বলে। হিংসা ও বিদ্বেষের মত এ ঘৃণিত অভ্যাসটিও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সময় দুনিয়াতেই এর শাস্তি এভাবে দিয়ে দেন যে, বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে এর উপর উল্লাসকারীকে বিপদে ফেলে দেন।

নম্রতা ও কঠোরতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তাঁর নৈতিক শিক্ষায় যেগুলো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন সকলের সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করে এবং কঠোরতা ও কর্কশতা পরিহার করে চলে। এ ধারার কয়েকটি হাদীস এখানে পাঠ করে নিন।

(١٥٤) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِيْ عَلٰى مَاسِوَاهُ * (رواه مسلم)

১৫৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোমল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর উপর ততটুকু দেন না, যতটুকু কোমলতার উপর দিয়ে থাকেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব ও আচরণে কঠোর ও কর্কশ হয়ে থাকে, আবার অনেকেই নম্র ও দয়ালু থাকে। যারা বাস্তবতা উপলব্ধিতে ব্যর্থ, তারা মনে করে যে, কঠোরতা দ্বারা মানুষ তা লাভ করতে পারে, যা নম্রতা ও কোমলতা দ্বারা লাভ করা যায় না। তাদের ধারণায় কঠোরতা যেন কার্যোদ্ধারের মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য সাধনের চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ ভ্রান্ত ধারণাও দূর করে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম তো তিনি নম্র স্বভাবের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এ বর্ণনা করেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি সত্তাগত গুণ। তারপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটা খুবই পছন্দনীয় বিষয় যে, তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক আচরণ ও ব্যবহার নম্র ও বিনয়যুক্ত হবে। তারপর শেষে বলেছেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া না হওয়া এবং কোন জিনিস লাভ হওয়া বা না হওয়া তো আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যা কিছু হয় তাঁরই ফায়সালা ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর তাঁর নীতি হচ্ছে এই যে, তিনি নম্রতার উপর এতটুকু দান করেন, যতটুকু কঠোরতার উপর দেন না; বরং নম্রতা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের উপরও আল্লাহ্ তা'আলা ততটুকু দান করেন না, যতটুকু নম্রতার উপর দেন। এ জন্য নিজের স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিতেও নিজের সম্পর্ক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মানুষকে নম্রতা ও কোমলতার নীতিই অবলম্বন করা চাই। অন্য শব্দমালায় কথাটি এভাবে বলতে পারেন যে, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ্ তার উপর সদয় হোন এবং তার কার্যসিদ্ধি করে দিন, সে যেন অন্যদের বেলায় সদয় থাকে এবং কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও কোমলতাকে নিজের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি বানিয়ে নেয়।

(١٥٥) عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ *

(رواه مسلم)

১৫৫। হযরত জারীর (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সমূহ কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, নম্রতা ও কোমলতা এমন একটি গুণ এবং এর মর্যাদা এত বেশী যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেল। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের অধিকাংশ কল্যাণ ও সাফল্যের মূলভিত্তি ও উৎস যেহেতু তার স্বভাবের নম্রতা। তাই যে ব্যক্তি এ স্বভাব থেকে বঞ্চিত রইল, সে সকল কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতা থেকেই বঞ্চিত থাকবে।

(١٥٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ *

(رواه البغوى فى شرح السنة)

১৫৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি কোমলতা গুণের অংশটি পেয়ে গেল, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশটি পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি নম্রতা গুণ থেকে বঞ্চিত রইল, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত থাকল। —শরহুস্‌সুন্নাহ

(١٥٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا اِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ اِيَّاهُ اِلَّا ضَرَّهُمْ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৫৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিবারের লোকদেরকে নম্রতার স্বভাব দান করেন, তাদেরকে উপকৃত করেই ছাড়েন। আর যে পরিবারের লোকদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদেরকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করেই ছাড়েন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম ও বিধান হচ্ছে এই যে, যে পরিবারের লোকদেরকে তিনি নম্রতা গুণ দান করেন, তাদের জন্য এ নম্রতা গুণসমূহ কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়। আর যাদেরকে তিনি এ গুণ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তারা অনেক ক্ষতি ও দুঃখ-বেদনার শিকার হয়।

মানুষের স্বভাবসমূহের মধ্যে কোমলতা এবং কঠোরতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এ দু'টির প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। যে ব্যক্তির মেযাজ ও আচরণে কঠোরতা ও নির্মমতা থাকবে, সে নিজের পরিবারের স্ত্রী, সন্তান, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য কঠোর হবে, প্রতিবেশীর অধিকারের বেলায় কঠিন হবে। সে যদি শিক্ষক হয়, তাহলে ছাত্রদের বেলায় কঠিন হবে। অনুরূপভাবে সে যদি শাসক অথবা কোন কর্মকর্তা হয়, তাহলে শাসিত ও অধীনস্থদের বেলায় কঠোর হবে। মোটকথা, জীবনে যেখানে যেখানে এবং যাদের সাথে তার পালা পড়বে তাদের সবার সাথেই তার ব্যবহার কঠোর হবে। আর এর ফল এ হবে যে, তার জীবন স্বয়ং তার জন্য এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিপদ হয়ে যাবে। অপর দিকে যার মেযাজে ও আচরণে নম্রতা ও কোমলতা থাকবে, সে পরিবারের লোকদের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থদের প্রতি, ছাত্র-উস্তাদের প্রতি এবং আপন ও পর সবার প্রতি বিনম্র ও কোমল থাকবে। আর এর ফল এই হবে যে, এ কোমলতার কারণে সে নিজেও শান্তিতে থাকবে এবং অন্যদের জন্যও সে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। তাছাড়া এ নম্রতা পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে এবং সম্মান, ভক্তি ও কল্যাণকামিতার অনুভূতি জাগ্রত করবে। পক্ষান্তরে স্বভাবের কঠোরতা ও রুক্ষতা অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে; হিংসা, মন্দ কামনা এবং ঝগড়া-বিবাদের অশুভ আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রজ্বলিত করবে।

কঠোরতা ও নম্রতার এ হল কয়েকটি পার্থিব ফলাফল, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যক্ষ করে থাকি এবং একটু চিন্তা করলে এর সুদূরপ্রসারী ফলও উপলব্ধি করতে পারি। এগুলো ছাড়া এ নম্রতা ও কঠোরতার যে বিরাট ফলাফল আখেরাতের জীবনে সামনে আসবে সেগুলো তো সময় আসলে সেখানেই প্রত্যক্ষ করা যাবে। তবে এ দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আমরা যতটুকু জানতে

ও বুঝতে পারি, এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত বাণীগুলিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এখানে এ ধারার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

(١٥٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

১৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব না, যে জাহান্নামের জন্য হারাম এবং জাহান্নামের আগুনও তার উপর হারাম ? (শুনে নাও, আমি বলে দিচ্ছি, জাহান্নামের আগুন হারাম) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর, যে গরম মেযাজী নয়, নম্র, মানুষের সাথে মিশুক এবং বিনম্র স্বভাবের। —আবূ দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উল্লেখিত হাইয়্যিনুন, লাইয়্যিনুন, কারীবুন ও সাহ্লুন এ চারটি শব্দই প্রায় একার্থবোধক এবং এগুলো নম্রতা ও কোমলতার বিভিন্ন দিককেই ফুটিয়ে তোলে। হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি নিজের মেযাজ ও আচরণে নম্র এবং নরম স্বভাবের কারণে মানুষের সাথে খুব মেলামেশা করে, দূরে দূরে এবং একা পৃথক হয়ে থাকে না। আর তার এ উত্তম ও মিষ্টি স্বভাবের কারণে মানুষও তাকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে এবং তার সাথে মেলামেশা করে। সে যার সাথে কথা বলে নম্রতা ও অনুগ্রহের সাথে কথা বলে, এমন মানুষ জান্নাতী। জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম।

এ ধরনের হাদীসের ব্যাখ্যায় একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মন-মস্তিষ্কে যেহেতু এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল (এবং দ্বীনের সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান রাখে, এমন প্রতিটি মানুষ আজও এতটুকু জানে) যে, এ ধরনের সুসংবাদের সম্পর্ক কেবল ঐসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের অপরিহার্য দাবীসমূহ যারা পূরণ করে চলে। এ জন্য এ জাতীয় সুসংবাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এ শর্তটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু মনে মনে এ শর্তটির কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, এটা এক স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ঈমান ছাড়া আল্লাহ্র কাছে কোন আমল ও সদগুণের কোনই মূল্য নেই।

(١٥٩) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ * (رواه ابوداؤد)

১৫৯। হারেছা ইবনে ওয়াহ্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে কখনো কখনো কোন মন্দকাজ অথবা খারাপ অভ্যাসের নিন্দাবাদ করতে গিয়ে এবং মানুষকে এ থেকে বাঁচানোর জন্য এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গীও অবলম্বন করা হয় যে, "এ কর্ম অথবা অভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।" আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এ

হয় যে, এ কর্ম অথবা অভ্যাসটি ঈমানের মর্যাদার পরিপন্থী এবং এটা জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। তাই জান্নাতের প্রত্যাশী প্রতিটি ঈমানদারকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ কাজ ও অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

হারেছা ইবনে ওয়াহ্বের এ হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই যে, কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব হওয়া ঈমানের পরিপন্থী একটি ঘৃণিত স্বভাব, যা জান্নাতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী এবং যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকা উচিত নয়। এ ঘৃণিত ও অপবিত্র স্বভাবের লোকেরা খাঁটি মু'মিনদের মত হতে পারবে না এবং তাদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাবের কোমলতা

(١٦٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ اَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا اَوْ اَلَا فَعَلْتَ هٰذَا * (رواه ابوداؤد)

১৬০। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তখন অল্প বয়স্ক এক তরুণ। এ জন্য আমার প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী হত না। (অর্থাৎ, কমবয়সী হওয়ার কারণে আমার পক্ষ থেকে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যেত।) কিন্তু দশ বছরের এ দীর্ঘ মেয়াদকালে তিনি কখনো "উহ্" শব্দ উচ্চারণ করে আমাকে তিরস্কার করেননি এবং কখনো একথা বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে অথবা এ কাজটি কেন করলে না। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমন করলেন, তখন হযরত আনাসের বয়স দশ বছরের কাছাকাছি ছিল। তাঁর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ খেদমতে ছিলেন। তাঁরই এ বর্ণনা যে, বয়স কম হওয়ার দরুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমার পক্ষ থেকে অনেক ত্রুটি হয়ে যেত। কিন্তু আমার কোন ভুল অথবা ত্রুটির উপর তিনি কখনো "উহ্" শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি এবং আমার উপর রাগ করেননি। নিঃসন্দেহে এটা খুবই কঠিন এক বিষয়; কিন্তু আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম জীবনাদর্শ এটাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের এ নম্রতা ও সহনশীলতার কিছু অংশ আমাদেরকেও দান করুন।

সহ্য, ধৈর্য অবলম্বন করা এবং রাগ না করা ও রাগ হজম করে ফেলা

(١٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ * (رواه البخارى)

১৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি তারপরও কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করল এবং তিনিও প্রতিবার একই কথা বললেন যে, রাগান্বিত হয়ো না। —বুখারী

ব্যাখ্যাঃ মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপদেশপ্রার্থী এ লোকটি খুব গরম মেযাজের ছিল এবং ক্রোধের কাছে পরাভূত ছিল। এ কারণে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী উপদেশ এটাই ছিল যে, রাগ করো না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বার বার এ একই উপদেশ দিলেন।

এটাও এক বাস্তব সত্য যে, মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহের মধ্যে রাগ বা ক্রোধ একটি মারাত্মক অভ্যাস, যা খুবই মন্দ পরিণতি ডেকে আনে। রাগের অবস্থায় মানুষের মধ্যে না আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি খেয়াল থাকে, না নিজের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য থাকে। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বলে যে, মানুষের উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ রাগের অবস্থায় যেমনটি চলে, অন্য কোন অবস্থায় হয়তো ততটা চলে না। মনে হয়, মানুষ তখন নিজের আয়ত্তে থাকে না; বরং শয়তানের মুঠিতে চলে যায়। এর চরম পর্যায় এই যে, রাগের মাথায় মানুষ কখনো কখনো কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, রাগ মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন মুছাব্বর মধুকে নষ্ট এবং তিক্ত বানিয়ে দেয়। (হাদীসটি কিতাবুল ঈমানে আগেও গিয়েছে।)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীঅতে যে রাগের নিষিদ্ধতা ও কঠোর নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ঐ রাগ, যা নফ্‌স ও প্রবৃত্তির কারণে হয় এবং যার কাছে পরাভূত হয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র সীমারেখা ও শরীঅতের বিধান অতিক্রম করে যায়। কিন্তু যে রাগ আল্লাহ্‌র জন্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে হয় এবং যাতে সীমা লংঘন হয় না; বরং মানুষ সেখানে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার সম্পূর্ণ ভিতরেই থাকে, সেই রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যবোধের পরিচায়ক।

রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত বীর

(١٦٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি বীর নয়, যে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলে; বরং প্রকৃত বীর ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার নফ্‌স, যাকে বশীভূত করতে খুবই বেগ পেতে হয়। যেমন, এক হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে স্বয়ং তোমারই নফ্‌স।" আর এটা জানা কথা যে, বিশেষ করে রাগের সময় এ নফ্‌সকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কঠিন হয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, বীর ও বাহাদুর নামে

অভিহিত হওয়ার প্রকৃত দাবীদার ঐ ব্যক্তিই হতে পারে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং নফ্সের চাহিদা তাকে দিয়ে কোন অন্যায় আচরণ ও ভুল কাজ করিয়ে নিতে না পারে।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দাবী এটা নয় যে, বান্দার অন্তরে ঐ অবস্থাই সৃষ্টি হবে না, যাকে রাগ, ক্রোধ ও গোস্সা বলা হয়। কেননা, কোন অপ্রীতিকর বিষয়ের কারণে অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া তো সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং নবী-রাসূলগণও এর বাইরে নন। তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দাবী হচ্ছে এই যে, এ অবস্থার সময়ও যেন মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এমন যেন না হয় যে, মানুষ এর সামনে পরাভূত হয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে দেবে যা দাসত্বের দাবীর পরিপন্থী।

রাগের সময় কি করা চাই

(١٦٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ * (رواه احمد والترمذى)

১৬৩। হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন রাগ আসে আর সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন বসে যায়। এভাবে যদি তার রাগ দূর হয়ে যায়, তাহলে তো ভাল। আর এতেও যদি রাগ প্রশমিত না হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাগ দমনের একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ও পন্থা বলে দিয়েছেন, যা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া এর আরেকটি উপকারিতা এও যে, রাগের মাথায় মানুষের পক্ষ থেকে যে সকল অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড ও অহেতুক কথাবার্তা প্রকাশ পেতে পারে, কোন জায়গায় সে স্থির হয়ে বসে গেলে এগুলোর সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। আর কোথাও শুয়ে গেলে এ সম্ভাবনা আরো অনেক কমে যায়।

(١٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ * (رواه احمد والطبرانى فى الكبير)

১৬৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদেরকে তোমরা দ্বীনের শিক্ষা দান কর এবং এ শিক্ষাদানে তোমরা সহজপন্থা ও নম্রতা অবলম্বন কর, কাঠিন্য আরোপ করো না। আর তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায়, তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে। —মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ রাগের মন্দ পরিণাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দ্বিতীয় কৌশল যে, যখন রাগ আসবে, তখন মানুষ

নীরবতা অবলম্বন করে নেবে। আর একথা স্পষ্ট যে, এমন করলে রাগ মনের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে এবং বিষয়টি আর আগে বাড়বে না।

(١٦٥) عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ * (رواه ابوداؤد)

১৬৫। আতিয়্যা ইবনে ওরওয়া সা'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাগ শয়তানের প্রভাবে আসে এবং শয়তান হচ্ছে আগুনের সৃষ্টি। আর আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। তাই তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায়, তখন যেন সে ওযূ করে নেয়। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাগ দমনের জন্য এটা হচ্ছে বিশেষ তদ্‌বীর ও কৌশল এবং এটা পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য কৌশলের চেয়েও অধিক কার্যকর। বাস্তব সত্য এই যে, রাগের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতার সময় যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি স্মরণে এসে যায় এবং সাথে সাথে উঠে গিয়ে পূর্ণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযূ করে নেওয়া হয়, তাহলে রাগের তীব্রতা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়ে যাবে এবং এমন মনে হবে যে, ওযূর পানি সরাসরি রাগ ও উত্তেজনার জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়েছে।

আল্লাহ্‌র জন্য রাগ হজম করে নেওয়ার পুরস্কার

(١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى * (رواه احمد)

১৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গোস্‌সার ঢোক্ অপেক্ষা উত্তম কোন ঢোক্ গলাধঃকরণ করে না, যা সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হজম করে নেয়। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাগ সংবরণ করাকে যেমন আমাদের ভাষায় "গোস্‌সা হজম করে ফেলা" বলে, আরবী ভাষারও বাক-পদ্ধতি তাই। হাদীসটির মর্ম এই যে, পান করার অনেক এমন জিনিস আছে, যেগুলো পান করা এবং হজম করে ফেলা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় গোস্‌সা হজম করে ফেলা।

যেসব সদগুণের অধিকারী বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রাখা হয়েছে, কুরআন মজীদে তাদের একটি গুণ এও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তারা গোস্‌সাকে হজম করে নেয় এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪)

(١٦٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ

يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ * (رواه الترمذى وابوداؤد)

১৬৭। সাহল ইবনে মো'আয তাঁর পিতা হযরত মো'আয (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রাগ সংবরণ করে নেয়—অথচ সে এটা কার্যকর করার শক্তি রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন বেহেশতী হুর বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন। —তিরমিযী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, রাগের তীব্রতার সময় মানুষের অন্তরের চরম ইচ্ছা এটাই হয় যে, সে রাগের দাবী পূরণ করে ফেলবে। অতএব, যে বান্দা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের মনের এ চরম ইচ্ছাকে দুনিয়াতে বলি দিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে এর বিনিময় এভাবে দান করবেন যে, সমগ্র সৃষ্টির সামনে তাকে ডেকে এনে বলবেন ঃ নিজের মনের ইচ্ছার ঐ কুরবানীর বিনিময়ে আজ বেহেশতী হূরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য নির্বাচন করে নাও।

(١٦٨) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৬৮। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মন্দ কথা থেকে) নিজের রসনাকে ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করে রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে আযাব ফিরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অন্যায়-অপরাধের জন্য আল্লাহ্র নিকট ওযর-আপত্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তার ওযর-আপত্তি কবূল করে নেন (এবং তাকে ক্ষমা করে দেন)। —বায়হাকী

ধৈর্য ও অচঞ্চলতা আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয় গুণ

(١٦٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ * (رواه مسلم)

১৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আব্দুল কায়েস গোত্রের সরদার "আশাজ্জ" কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয় ঃ (১) ধৈর্য, (রাগের কারণে পরাভূত না হওয়া।) (২) স্থিরতা অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি না করা। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য মদীনায় এসেছিল। প্রতিনিধি দলের সবাই নিজ নিজ বাহন থেকে লাফালাফি করে নেমে দ্রুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে গেল। কিন্তু দলনেতা যার নাম ছিল মুনযির এবং ডাকনাম আশাজ্জ— তিনি তাড়াহুড়া করলেন না; বরং বাহন থেকে নেমে প্রথমে সব সামানপত্র একত্রিত ও এগুলোর হেফাযতের ব্যবস্থা করলেন। তারপর গোসল করলেন এবং পোশাক পরিবর্তন করে গাম্ভীর্যের সাথে ধীরস্থিরে দরবারে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ চাল-চলন খুব পছন্দ করলেন এবং এ ক্ষেত্রেই তিনি বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিকট খুবই প্রিয়। এর একটি হচ্ছে ধৈর্য ও গাম্ভীর্য অর্থাৎ, ক্রোধের কাছে পরাভূত না হওয়া এবং ক্রোধের সময়ও সংযমচিত্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অচঞ্চলতা, অর্থাৎ, কোন কাজে তাড়াহুড়া না করা; বরং প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে সম্পাদন করা।

প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে ও স্বস্তির সাথে সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ দান

(١٧٠) عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ * (رواه الترمذى)

১৭০। হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়িদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধীরে সুস্থে কাজ করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ প্রতিটি দায়িত্ব ধীরে সুস্থে সম্পাদন করার অভ্যাস একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার তওফীকেই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে তাড়াহুড়া করা একটি মন্দ অভ্যাস এবং এতে শয়তানের দখল থাকে।

(١٧١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعٍ وَّ عِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ * (رواه الترمذى)

১৭১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চাল-চলন, ধীরে-স্থিরে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এ তিনটি জিনিসের গুরুত্ব বর্ণনা করা এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদান। এটা নবুওয়তের অংশ হওয়ার অর্থ বাহ্যতঃ এই যে, নবীদের জীবন যেসব সৌন্দর্য ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত থাকে, এ তিনটি গুণ এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। অথবা বলা যায়, মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠনে নবী-রাসূলগণ যেসব অভ্যাস ও গুণাবলীর শিক্ষা দিতেন, এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এ তিনটি জিনিস ঃ (১) উত্তম চাল-চলন, (২) ধীরে সুস্থে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং (৩) মধ্যম পন্থা অবলম্বন।

মধ্যম পন্থার ব্যাখ্যা

আমরা হাদীসে উল্লেখিত "ইকতেসাদ" শব্দের অনুবাদ করেছি মধ্যম পন্থা। এর অর্থ হচ্ছে

সর্বাবস্থায় বাহুল্য ও সঙ্কোচন থেকে বেঁচে থাকা এবং এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও উপদেশে এ বিষয়টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। এমনকি এবাদতের মত সর্বোত্তম কর্মেও তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী খুব বেশী এবাদত করার ইচ্ছা করলেন, অর্থাৎ, দিনের বেলায় সর্বদা রোযা রাখার এবং সারা রাত জেগে নফল নামায পড়ার পরিকল্পনা করলেন। একথা শুনে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন এবং এ থেকে নিষেধ করে দিলেন। অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী যখন তাদের সকল সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করলেন এবং কেবল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ খরচ করার অনুমতি দিলেন। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে "ইকতেসাদ" তথা মধ্যম পন্থা।

কিতাবুর রিকাকে আপনি এমন অনেক হাদীস পড়ে এসেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব-অনটন এবং সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ দিয়েছেন। এর মর্ম এটাই যে, মানুষ অভাব-অনটন ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলবে। আর এটাকেই এ হাদীসে নবুওয়াতের একটা অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিষ্টি কথা ও কর্কশ ভাষা

মানুষের নৈতিক জীবনের যেসব দিক দিয়ে তার সমজাতির সাথে সর্বাধিক পালা পড়ে এবং যেগুলোর প্রভাব ও ফলাফল খুবই সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, এগুলোর মধ্যে তার ভাষার মিষ্টতা ও তিক্ততা এবং বাক্যালাপে নম্রতা ও কঠোরতা অন্যতম। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারী ও ভক্তদেরকে মিষ্টি কথা ও মধুর ভাষা ব্যবহার করতে খুব তাকীদ করতেন এবং খারাপ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করতেন। এমনকি মন্দ কথার উত্তরেও মন্দ কথা বলতে তিনি পছন্দ করতেন না। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস পাঠ করে নিন।

(١٧٢) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ *

(رواه البخارى)

১৭২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হল এবং তারা (নিজেদের ভ্রষ্টতা ও দুষ্টামির কারণে আস্‌সালামু আলাইকুম-এর স্থলে) বলল ঃ আস্‌সামু আলাইকুম। (যা প্রকৃতপক্ষে একটি গালি এবং এর অর্থ হচ্ছে তোমার মরণ হোক।) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের হোক, আর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও গযবও নামুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আয়েশা! রসনা সংযত কর, নম্রতার পথ অবলম্বন কর। কঠোরতা ও কটু বাক্য পরিত্যাগ কর। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ ইয়াহুদীদের চরম ঔদ্ধত্যের জবাবেও কঠোরতাকে পছন্দ করলেন না; বরং নম্র ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন।

(١٧٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا لَعَّانٍ وَلَافَاحِشٍ وَلَا بَذِيٍّ * (رواه الترمذى)

১৭৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কটুভাষী হয় না, অভিসম্পাতকারী হয় না, অশ্লীল ভাষী ও গালিগালাজকারী হয় না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিনের অবস্থান ও তার চরিত্র এই হওয়া চাই যে, তার মুখ দিয়ে কটু কথা ও গালিগালাজ বের হবে না। কিতাবুল ঈমানে ঐ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে ঝগড়া-বিবাদের সময় গালমন্দ করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে।

(١٧٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهٗ فَلَمَّا دَخَلَ الْاٰنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهٗ مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ وَدَعَهُ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهٖ * (رواه البخارى ومسلم وابوداؤد واللفظ له)

১৭৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন ঃ এ লোকটি তার গোত্রের মন্দ সন্তান অথবা বললেন ঃ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুবই খারাপ মানুষ। তারপর তিনি বললেন ঃ একে আসার অনুমতি দাও। পরে সে যখন ভিতরে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন। লোকটি যখন চলে গেল, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ আগে আপনি তারই ব্যাপারে এ কথা বলেছিলেন (যে, সে খুবই খারাপ লোক।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ হবে ঐ ব্যক্তি, যার কটু ভাষার কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (অর্থাৎ, তার সাথে মেলামেশা ও কথা-বার্তা বলা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, কোন মানুষ যদি মন্দ ও দুষ্টও হয়, তবুও তার সাথে কথা নম্রতা ও ভদ্রতার সাথেই বলতে হবে। অন্যথায় মন্দভাষা ও কটুকথার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, এমন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে ও কথা বলতে মানুষ পলায়নপর হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এই হয়, সে আল্লাহ্‌র নিকট খুবই মন্দ এবং কেয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে খুবই খারাপ। এ হাদীসটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বুঝে নেওয়া উচিত ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তির আগমনের পূর্বেই উপস্থিত লোকদেরকে তার মন্দ হওয়ার অবগতি সম্ভবতঃ এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে তারা তার সামনে

সতর্ক হয়ে কথা বলে এবং এমন কোন কথা যেন না বলে ফেলে, যা কোন দুষ্ট ও খারাপ মানুষের সামনে বলা যায় না। এমন কোন পরিণামদর্শিতার কারণে কারো কোন দোষের ব্যাপারে অন্যদেরকে সতর্ক করা গীবত ও পরনিন্দার মধ্যে গণ্য নয়; বরং এমন করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাপাচারী ও খারাপ মানুষের মধ্যে যে দোষ থাকে, তা লোকদেরকে বলে দাও, যাতে আল্লাহ্‌র বান্দারা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। —কানযুল উম্মাল

(২) এ হাদীস থেকে একথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি মন্দ ও দুষ্ট হলেও তার সাথে নরমভাবেই কথা বলতে হবে। এ ঘটনা সম্পর্কেই বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এ শব্দমালা এসেছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন ও কথাবার্তা বললেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, পাপাচারী ও মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করাও উচিত নয়, এ ধারণা ঠিক নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা অনেক এমন মানুষের সাথেও হাসিমুখে সাক্ষাত করি এবং কথা বলি, যাদের অবস্থা ও কর্মের কারণে আমাদের অন্তর তাদেরকে অভিসম্পাত করে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কঠোর আচরণ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশের মধ্যেই যদি কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে সেখানে এমন পন্থা অবলম্বন করাও ঠিক হবে।

(৩) এ হাদীসেরই আবূ দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি নিজেই বলেছিলেন যে, লোকটি খুবই খারাপ, তার সাথে আপনি আবার কেমন করে হাসিমুখে কথা বললেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা কটুভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। মর্ম এই যে, কটুকথা বলার অভ্যাস মানুষকে আল্লাহ্‌র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই আমি কেমন করে এ দোষে লিপ্ত হতে পারি।

(١٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى)

১৭৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ উত্তম ও মিষ্টি কথাও একটি সদকা। (অর্থাৎ, এক ধরনের পুণ্য, যার দ্বারা বান্দা প্রতিদান ও পুরস্কারের অধিকারী হয়।) —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটা আসলে একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। ইমাম বুখারী এ পূর্ণ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন এবং এক স্থানে সনদ উল্লেখ ছাড়া কেবল এ অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। এর মর্ম স্পষ্ট যে, কারো সাথে মধুর ভঙ্গিতে উত্তম কথা বললে এটা তার খুশী ও আনন্দের কারণ হয়। আর আল্লাহ্‌র কোন বান্দার মনে আনন্দ দান করা নিঃসন্দেহে বড় পুণ্য কাজ।

কথা কম বলা এবং খারাপ ও অহেতুক কথা থেকে রসনার হেফাযত করা

দুনিয়াতে যেসব ঝগড়া-বিবাদ ও গন্ডগোল হয়ে থাকে, এগুলোর অধিকাংশই অসংযত কথা-বার্তার কারণে হয়ে থাকে, তাছাড়া মানুষের পক্ষ থেকে যেসব বড় বড় গুনাহ্ প্রকাশ পায়, এগুলোর সম্পর্কও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসনার সাথেই থাকে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ তাকীদ করতেন যে, রসনাকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং সর্বপ্রকার মন্দ কথা; বরং অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন কথা থেকেও যেন রসনাকে বিরত রাখা হয়। কথা বলার যখন বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা না দেয় এবং এ কথার দ্বারা কোন কল্যাণ ও লাভের আশা না থাকে, তখন যেন নীরবতাই অবলম্বন করা হয়। এ শিক্ষাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর উপর মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামায, রোযা, হজ্জ এবং জেহাদের মত এবাদতসমূহের দীপ্তি ও সাদর গ্রহণযোগ্যতাও রসনার এ সতর্ক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস "কিতাবুর রিকাকে" ইতঃপূর্বেই এসে গিয়েছে। নিম্নে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(١٧٦) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَاَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَّسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِى الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ- ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -- حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَاْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ- ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

১৭৬। হযরত মো'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি একটি বিরাট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, তবে (বিষয়টি বিরাট ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও) ঐ বান্দার জন্য সহজ, যার জন্য আল্লাহ্ সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ্র এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে। তারপর বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহের সন্ধান দিব না ? (এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এগুলো ইসলামের

ফরয বিধান ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন ঃ তুমি যদি চাও, তাহলে আমি তোমাকে কল্যাণ লাভের আরো কিছু বিষয়ের কথা বলে দেব। সম্ভবতঃ এ কথার দ্বারা নফল এবাদত উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি হযরত মো'আযের আগ্রহ দেখে বললেন ঃ) রোযা হচ্ছে (গুনাহ্ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী) ঢাল, সদাকা গুনাহ্কে (এবং গুনাহের কারণে সৃষ্ট আগুনকে) এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। আর কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায। (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নামাযেরও এ অবস্থা এবং কল্যাণের দ্বারসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।) তারপর তিনি (তাহাজ্জুদ ও দানের ফযীলত প্রসঙ্গে) সূরা সেজদার এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের প্রতিপালককে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুক্কায়িত রয়েছে, তা কেউ জানে না। এটা হবে তাদের কর্মের প্রতিদান।

তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে দ্বীনের শির, এর স্তম্ভ এবং এর উচ্চ শিখরের সন্ধান দেব না ? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি তখন বললেন ঃ দ্বীনের শির হচ্ছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে নামায, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জেহাদ। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐ জিনিসের কথা বলে দেব, যার উপর ঐসব কিছু নির্ভর করে ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি তখন নিজের জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটাকে নিবৃত রাখ। (অর্থাৎ, নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ।) আমি আরয করলাম, আমরা যেসব কথা-বার্তা বলি, এগুলোর জন্যও কি আমাদেরকে ধরা হবে ? তিনি বললেন ঃ হে মো'আয! তোমার মা তোমার উপর কাঁদুক। (আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এটা প্রীতিবাক্য।) মানুষকে তাদের মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে এ অসংযত কথা-বার্তাই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকানে ইসলামের পর "কল্যাণের দ্বার" শিরোনামে রোযা এবং দান খয়রাতের যে আলোচনা করেছেন, এ অধমের নিকট এর দ্বারা নফল রোযা এবং নফল দান উদ্দেশ্য। এ জন্যই তিনি এর সাথে তাহাজ্জুদ নামাযের উল্লেখ করেছেন, যা নফল নামাযসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তিনি ইসলামকে দ্বীনের শির নামে অভিহিত করেছেন। বাহ্যত এখানে ইসলাম দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা এবং এটাকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য। আর তখন এর মর্ম এই হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি সকল পুণ্য কাজ করে নেয় এবং তার চরিত্র এবং আচার-আচরণও ভাল হয়; কিন্তু সে ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে না নেয়, তাহলে তার উদাহরণ হবে এমন একটি দেহের মত, যার হাত পা ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু মাথা নেই।

তারপর নামাযকে তিনি দ্বীনের স্তম্ভ বলেছেন। এর মর্ম এই যে, যেভাবে স্তম্ভ ছাড়া কোন ঘর টিকে থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে নামায ছাড়া দ্বীন কায়েম থাকতে পারে না। তারপর তিনি জেহাদকে দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর বলে উল্লেখ করেছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, দ্বীনের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি জেহাদের উপরই নির্ভরশীল।

হাদীসের সর্বশেষ অংশ—যার কারণে হাদীসটি এখানে আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপরে উল্লেখিত সবগুলো জিনিসের

নির্ভরশীলতা এর উপর যে, মানুষ তার রসনাকে হেফাযত করবে। কেননা, লাগামহীন কথা-বার্তা মানুষের ঐসব পুণ্য আমলকে ওজনহীন ও দীপ্তিশূন্য করে দেয়। তারপর হযরত মো'আয একথা শুনে যখন আশ্চর্যবোধ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুখের কথার উপরও কি আমাদের পাকড়াও হবে ? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ অনেক মানুষকেই এ রসনার অপব্যবহার ও লাগামহীন কথাবার্তার কারণেই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আজও প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজ চোখেই দেখে নিতে পারে যে, যেসব বড় বড় গুনাহ্ মহামারীর মত ব্যাপক আকার ধারণ করে আছে এবং যেগুলো থেকে আত্মরক্ষাকারী মানুষ খুবই কম, এগুলোর সম্পর্ক অধিকাংশই রসনা ও মুখের সাথেই। জনৈক কবি বলেছেন ঃ মানুষের উপর ক্ষতিকারক যা কিছু আসছে, এর সবগুলোই হচ্ছে রসনা ও মুখের ফল।

(١٧٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا * (رواه الترمذى)

১৭৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যখন প্রভাত করে, তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয় ও অনুরোধের সাথে জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর (এবং আমাদের উপর দয়া কর।) কেননা, আমরা তোমারই সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হয়ে গেলে আমরাও বাঁকা হয়ে যাব (এবং পরে এর মন্দ পরিণাম সবাইকে ভোগ করতে হবে।) —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীস থেকে জানা গিয়েছিল যে, মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গসমূহের মধ্য থেকে জিহ্বার অপপ্রয়োগজনিত কারণেই মানুষ বেশী জাহান্নামে যাবে। এ হাদীসে বলে দেওয়া হয়েছে যে, জিহ্বার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিদিন মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিহ্বাকে বলে যে, আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ তোমার সাথেই সম্পর্কিত। এ জন্য তুমি আমাদের উপর দয়া কর এবং আল্লাহ্ থেকে নির্ভয় হয়ে লাগামহীন হয়ে যেয়ো না। অন্যথায় তোমার সাথে আমরাও আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হয়ে যাব।

অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে অন্তরের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা যখন ঠিক থাকে, তখন সারা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ঠিক থাকে। কিন্তু এ দুটি কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। আসল তো অন্তরই; কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গসমূহের মধ্যে যেহেতু জিহ্বাই এর বিশেষ মুখপাত্র, তাই উভয়টির ধরন একই যে, এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক। আর যদি ও দু'টোর মধ্যে বক্রতা এসে যায়, তাহলে আর মানুষের রক্ষা নেই।

(١٧٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ * (رواه البخارى)

১৭৮। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার মুখ ও যৌনাঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবে (যে, এ দু'টির অপপ্রয়োগ হবে না,) আমি তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিচ্ছি। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা ছাড়া অন্য যে অঙ্গটির অপব্যবহার থেকে হেফাযত করার গুরুত্ব খুবই বেশী, সেটা হচ্ছে মানুষের যৌন অঙ্গ। এ জন্য এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয়টির ব্যাপারে বলেছেন যে, যে বান্দা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে অপব্যবহার থেকে নিজের জিহ্বাকেও হেফাযত করবে এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকেও আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে রাখবে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি।

এখানে আবার সেই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের বক্তব্যের সম্বোধিত ব্যক্তি হতেন ঐসব ঈমানদারগণ, যারা তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা এ মৌলিক সত্যকে জেনে নিয়েছিলেন যে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক কেবল ঐসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের মৌলিক দাবীসমূহও তারা পূরণ করে থাকে।

(١٧٩) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هٰذَا * (رواه الترمذى)

১৭৯। হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর আপনি যেসব জিনিসের আশংকা করেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আশংকার বস্তু কোন্‌টি ? সুফিয়ান বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বাটি ধরলেন এবং বললেন ঃ সবচেয়ে আশংকার বস্তু হচ্ছে এটি। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, তোমার পক্ষ থেকে আমি অন্য কোন মন্দের তো বেশী আশংকা করি না, তবে আমার এ ভয় যে, তোমার জিহ্বা লাগামহীন হয়ে যায় কিনা। তাই এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকবে। হতে পারে যে, প্রশ্নকারী সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহর ভাষা কিছুটা কড়া ছিল এবং এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলেছিলেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(١٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا * (رواه احمد والترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

১৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেয়ে গেল। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি খারাপ কথা ও অহেতুক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখল, সে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল। এ মাত্র হযরত মো'আয (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষ বেশীর ভাগ অসংযত কথাবার্তার কারণেই উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(١٨١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَالنَّجَاةُ ؟ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكَ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ * (رواه احمد والترمذى)

১৮১। হযরত উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মুক্তি লাভের উপায় কি ? (এবং এ মুক্তি লাভের জন্য আমাকে কি করতে হবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ, নিজের ঘরেই পড়ে থাক এবং নিজের গুনাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি কর। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখা এবং নিজের গুনাহ্‌র জন্য কান্নাকাটি করার মর্ম তো স্পষ্ট। তবে এ দু'টি ছাড়া তৃতীয় যে উপদেশটি তিনি দিয়েছেন যে, "নিজের ঘরে পড়ে থাক" এর অর্থ এই যে, যখন বাইরে প্রয়োজনীয় কোন কাজ না থাকে, তখন আড্ডাবাজ ও ভবঘুরেদের মত বাইরে ঘুরাফেরা করো না; বরং নিজের ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থেকে বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশুনা কর এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করে যাও। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, বিনা প্রয়োজনে বাইরে ঘুরাফেরা করা অনেক অনিষ্ট ও ফেতনার কারণ হয়ে যায়।

(١٨٢) عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَاَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ ؟ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৮২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন দু'টি অভ্যাসের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারি ? আমি আরয করলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি তখন বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতার অভ্যাস ও সচ্চরিত্রতা। ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সৃষ্টিকুলের আমলসমূহের মধ্যে এ দু'টির তুলনা হয় না। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশী নীরব থাকার অর্থ এটাই যে, মানুষ অপ্রয়োজনীয় ও অশোভন কথাবার্তা থেকে নিজের জিহ্বাকে ফিরিয়ে রাখবে। আর যে ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি এই হবে, সে স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পভাষী ও দীর্ঘ নীরবতা পালনকারী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কথা বলার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির পথ প্রদর্শনের কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি এ প্রয়োজনে কথা বলতে ত্রুটি করতেন না; বরং বলার মত ছোট বড় সব কথাই বলতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশী নীরব থাকতেন। (শরহুস্ সুন্নাহ) অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিনি কেবল ঐ কথাই বলতেন, যার উপর তিনি সওয়াবের আশা করতেন। —তাবরানী

(١٨٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِى الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৮৩। ইমরান ইবনে হিত্তান তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখি যে, তিনি মসজিদে একটা কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে একাকী বসে আছেন। আমি বললাম, হে আবূ যর! এটা কেমন একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা। (অর্থাৎ, আপনি এভাবে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ থাকা কেন অবলম্বন করলেন ?) তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খারাপ সাথীর সঙ্গ থেকে একা থাকা ভাল, আর সৎসঙ্গ একাকিত্বের চেয়ে উত্তম। কাউকে ভাল কথা বলে দেওয়া নীরব থাকার চেয়ে ভাল, আর মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভাল। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসে গিয়েছে যে, নীরব থাকার যে ফযীলত, সেটা হয় মন্দ কথা বলার তুলনায়। অন্যথায় ভাল কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাহচর্যের চেয়ে একা থাকা ভাল। কিন্তু পুণ্যবানদের সাহচর্য একাকিত্বের চেয়ে উত্তম।

ফায়েদা ঃ এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম কথা এই বুঝে নেওয়া চাই যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রকৃতি, তাদের যোগ্যতা এবং ঝোঁক-প্রবণতা বিভিন্ন হয়ে থাকে। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শে এমন বিজ্ঞজনোচিত প্রশস্ততা ও সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে যে, বিভিন্ন মেযাজ ও বিভিন্ন মনের মানুষ নিজেদের মেযাজ ও রুচি অনুযায়ী তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টির সুউচ্চ স্থান লাভ করে নিতে পারে। যেমন, অনেক লোকের মন-মেযাজ এমন থাকে যে, যে ধরনের লোকদেরকে সে পছন্দ করে না, তাদের সাথে মেলামেশা করা তার জন্য খুবই কঠিন ও ভারী হয়ে যায় এবং এ ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা রাখাতে সে নিজের ক্ষতি মনে করে। এ ধরনের মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা বর্তমান রয়েছে, যার উল্লেখ হযরত আবূ যর গেফারী এ হাদীসে করেছেন এবং যার উপর তিনি স্বয়ং আমল করতেন।

অপরদিকে অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি ও মেযাজের দিক দিয়ে এমন হয়ে থাকে যে, যেসব লোকের অবস্থা ও চাল-চলন তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়, তাদেরও সংশোধন এবং তাদেরকে সুপথে আনার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে নিজেদেরকে হেফাযতে রেখে বিভিন্নভাবে তাদের খেদমত করা তাদের জন্য কোন কঠিন বিষয় মনে হয় না; বরং এর প্রতি তাদের একটা ঝোঁক ও আকর্ষণ থাকে। তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য হাদীসে (যেগুলো যথাস্থানে আসবে।) এ কর্মপদ্ধতিরই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা আবূ যর (রাঃ)-এর মত নির্জনতা প্রিয় ছিলেন না, তাঁদের কর্মপদ্ধতি এটাই ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনের

কোন কোন ক্ষেত্রে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের বিভিন্ন মহলের কর্মপদ্ধতিতে এ ধরনের যে বিভিন্নরূপ কোথাও কোথাও দেখা যায়, এটা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন মন-মেযাজের স্বাভাবিক পার্থক্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার এক অনিবার্য ফল। তাই যারা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে একই অবস্থার এবং সম্পূর্ণ একইরূপে দেখতে চান, তারা আসলে দ্বীনের ব্যাপক রূপ, নববী শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিরহস্য ও তাঁর বিধানের হেকমতের বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখেননি।

অহেতুক কথা বর্জন

(١٨٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ * (رواه مالك واحمد و رواه ابن ماجة عن ابى هريرة والترمذى والبيهقى فى شعب الايمان عنهما)

১৮৪। হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইসলামী জিন্দেগীর একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কথাবার্তা পরিহার করে চলে। —মোয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা না বলা এবং বাজে কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঈমানের পরিপূর্ণতার দাবী এবং মানুষের ইসলামী জীবন ধারার এক মহান সৌন্দর্য। এ গুণকেই সংক্ষেপে "অহেতুক কথা ও কাজ বর্জন" বলে।

পরনিন্দা

যেসব বদভ্যাসের সম্পর্ক জিহ্বার সাথে হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সবিশেষ তাকীদ করেছেন, এগুলোর মধ্যে পরনিন্দা অন্যতম। কারো এমন কোন বক্তব্য অন্যের গোচরীভূত করা, যার দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং একজনের অপরজনের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়, এ মন্দ অভ্যাসের নাম হচ্ছে চোগলখোরী ও পরনিন্দা।

যেহেতু পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন নববী শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম, (এমনকি এক হাদীসে এটাকে কোন কোন দিক দিয়ে এবাদতের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।) এ জন্য যে জিনিসটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে হিংসা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা সৃষ্টি করে, সেটা অবশ্যই মারাত্মক পাপ হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনিন্দাকে কঠিন গুনাহ্ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং আখেরাতে এর যে মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

(١٨٥) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ * (رواه البخارى وفى رواية مسلم نمام)

১৮৫। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পরনিন্দাকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, পরনিন্দা ও চোগলখোরীর অভ্যাস ঐসব মারাত্মক গুনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় হবে এবং কোন মানুষ এ অপবিত্র ও শয়তানী স্বভাবের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজের অনুগ্রহে কাউকে মাফ করে দিয়ে অথবা এ অপরাধের শাস্তি দিয়ে তাকে পবিত্র করে নেন, তাহলে এরপর জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে।

(١٨٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৮৬। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গুন্‌ম ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা হচ্ছে তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। আর নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারা, যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহ্‌র নিষ্পাপ বান্দাদেরকে কোন গুনাহে জড়িত করে দিতে অথবা কষ্টে ফেলে দিতে প্রয়াসী থাকে। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এ লক্ষণ বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা চোগলখোরীতে অভ্যস্ত, চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের পেশা এবং যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের বদনাম ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে।

অতএব মানুষের উচিত, সাহচর্য ও ভালবাসার জন্য আল্লাহ্‌র এমন বান্দাদেরকে খুঁজে বের করা, যাদেরকে দেখলে অন্তরের উদাসীনতা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ এসে যায়। এর বিপরীত— যারা আল্লাহ্‌কে চিনে না এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে, মানুষের বদনাম করা ও ক্ষতিসাধন করা যাদের নেশা, এমন লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখবে এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।

(١٨٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ * (رواه ابوداؤد)

১৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সহচরদের মধ্য থেকে কেউ যেন কারো কোন মন্দ কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। কেননা, আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন যেন আমার অন্তর (সবার প্রতি) পরিষ্কার ও নির্মল থাকে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যের ব্যাপারে এমন কথা শুনতেও যেন মানুষ বিরত থাকে, যার দ্বারা তার অন্তরে কুধারণা এবং মনোবেদনা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। (তবে মনে রাখতে হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে শরয়ী প্রয়োজন এবং দ্বীনী স্বার্থের দাবীই হচ্ছে এমন কথা বলে দেওয়া অথবা শ্রবণ করা, সেসব ক্ষেত্র এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে।)

কারো অগোচরে নিন্দা ও অপবাদ প্রসঙ্গ

চোগলখোরী দ্বারা যে ধরনের বিপর্যয় ও ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসে, এর চাইতেও মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতি গীবত ও অপবাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। গীবত হচ্ছে কোন ভাইয়ের এমন কথা অথবা তার এমন কোন কর্ম ও অবস্থা অন্যের কাছে বলে দেওয়া, যার উল্লেখ সে অপছন্দ করে এবং এর দ্বারা সে মনে কষ্ট পায় এবং অপমানবোধ করে। যেহেতু গীবত দ্বারা একজন মানুষের অপমান ও বেইজ্জতি হয়, তার অন্তর আহত হয় এবং অন্তরে ফেতনা ও মনোমালিন্যের বীজ অংকুরিত হয়— যার ফল কখনো কখনো খুবই মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হতে দেখা যায়, এ জন্য গীবতকে শরীঅতে খুবই কঠিন গুনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। গীবতের ঘৃণ্যতা ও এর জঘন্যতা বুঝানোর জন্য কুরআন ও হাদীসে এটাকে "মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া"র সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাহোক, গীবতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য চরিত্র এবং কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে অপবাদ এর চেয়েও মারাত্মক। অপবাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কোন বান্দার প্রতি এমন কোন খারাপ কর্ম অথবা মন্দ চরিত্রের কথা আরোপ করা, যা থেকে সে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। এ কথা স্পষ্ট যে, এটা মানুষের দুর্ভাগ্য ডেকে আনে এবং এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ্র দরবারেও অপরাধী এবং মানুষের কাছেও অপরাধী। এ ভূমিকার পর এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কয়টি হাদীস পাঠ করুন ঃ

(١٨٨) عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ قَلْبَهٗ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ فِىْ بَيْتِهٖ * (رواه ابوداؤد)

১৮৮। হযরত আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে ঐ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং ঈমান এখনও তাহার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গোপন দোষের অনুসন্ধানে লেগে যেও না। কেননা, যে ব্যক্তি এমন করবে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমন আচরণ করবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অন্বেষণ করবেন, তিনি তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করে ছাড়বেন। —আবু দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন মুসলমানের গীবত করা এবং তার দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশে উৎসুক হওয়া প্রকৃতপক্ষে এমন এক মুনাফেকসুলভ কর্ম, যা কেবল ঐসব লোক থেকেই প্রকাশিত হতে পারে, যারা কেবল মুখে মুসলমান এবং ঈমান তাদের অন্তরে স্থান করে নিতে পারেনি।

(١٨٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ * (رواه ابوداؤد)

১৮৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমাকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, তখন (ঐ ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণে) আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার এবং তারা এগুলো দিয়ে খুবলে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষ আহত করে যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন, এরা ঐসব লোক, যারা মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দাদের গীবত করত) এবং তাদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করত। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তামার নখের যে উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য এই যে, তাদের নখগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত লাল তামার মত ছিল এবং তারা এ নখগুলো দিয়েই তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশকে খাবলে খাবলে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। তাদের জন্য বরযখ জগতে এ বিশেষ শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার রহস্য এই যে, দুনিয়ার জীবনে এ অপরাধীরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের গোশ্‌ত খুবলে তুলে নিত অর্থাৎ, গীবত করত এবং এটা ছিল তাদের প্রিয় নেশা।

(١٩٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ) وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৯০। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও বেশী জঘন্য। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য হয় কিভাবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ মানুষ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েই যায় এবং তওবা করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে যে পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে মাফ না করে দেয়, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার ক্ষমা হয় না। —বায়হাকী

(١٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ * (رواه مسلم)

১৯১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন ঃ তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কোন বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। সাহাবীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, বলুন তো! আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই বিদ্যমান থাকে ? তিনি উত্তর দিলেন, তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমান থাকলেই তো বলা হবে যে, তুমি গীবত করেছ। আর যদি তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমানই না থাকে, তাহলে তো তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে (যা গীবতের চেয়েও জঘন্য)। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা গীবতের স্বরূপ এবং গীবত ও অপবাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। আর একথাও জানা গেল যে, অপবাদ আরোপ করা গীবত করার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য।

ফায়দা ঃ এখানে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যদি আল্লাহ্র বান্দাদের কল্যাণ কামনায় অথবা কোন ধরনের ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাস্তব দোষ অন্যের সামনে বর্ণনা করা জরুরী হয়ে যায়, অথবা কোন দ্বীনী, নৈতিক কিংবা সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর দোষ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং কোন কোন অবস্থায় এটা সওয়াবের কাজ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন, বিচারক ও হাকিমের সামনে জালেমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া, কোন পেশাদার প্রতারকের প্রতারণা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, যাতে মানুষ তার প্রতারণার শিকার না হয়।

মুহাদ্দেসগণ যে অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করে থাকেন এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বাতেলপন্থীদের দোষ ও তাদের ভণ্ডামী সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করে থাকেন, এগুলোও এ ধরনের দ্বীনী প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। তাই এটাও নিষিদ্ধ গীবত নয়।

দ্বিমুখীপনার নিষিদ্ধতা

অনেক মানুষের এ অভ্যাস থাকে যে, যখন দু'ব্যক্তি অথবা দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ দেখা দেয়, তখন সে উভয় পক্ষের সাথে মিলে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। তেমনিভাবে অনেকের অবস্থা এই হয় যে, যখন কারো সাথে মিলিত হয়, তখন তার সাথে নিজের সুন্দর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু পশ্চাতে তার দোষ ও সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলে। এ ধরনের মানুষকে দুমুখা বলা হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ কর্মনীতি এক ধরনের মুনাফেকী এবং এক প্রকার প্রতারণা যা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদেরকে কঠোর তাকীদ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, এটা জঘন্য গুনাহ এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তিরা কঠোরতর আযাবের সম্মুখীন হবে।

(١٩٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৯২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে এদের কাছে এক মুখ নিয়ে যায়, আবার ওদের কাছে আরেক মুখ নিয়ে হাজির হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অবস্থায় দেখা যাবে, এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

(١٩٣) عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ * (رواه ابوداؤد)

১৯৩। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুমুখী হবে, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ সৎকর্ম এবং সৎস্বভাবসমূহ— যেগুলোর উপর আখেরাতে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, এগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং এগুলোর স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম এবং মন্দ স্বভাবসমূহ— যেগুলোর উপর আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন স্তরের। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যেক ভাল ও মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্ধারণ করেছেন। তাই দ্বিমুখীপনা (যা এক ধরনের মুনাফেকী) এর শাস্তি এই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এ চরিত্রের মানুষের মুখে সেখানে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে। মনে রাখা চাই যে, কোন কোন সাপের দু'টি জিহ্বা থাকে।

এখানে এ কথাটি আমাদের সবার জন্য ভাবনার বিষয় যে, কোন কোন মন্দ কর্ম ও মন্দ স্বভাব বাস্তবে খুবই ভয়াবহ এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু আমরা এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার মনে করি এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, আমরা ততটুকু যত্নবান হই না। এ ধরনের মন্দ বিষয়সমূহ সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ তোমরা এটাকে সাধারণ ব্যাপার এবং হাল্কা বিষয় মনে কর, অথচ আল্লাহ্র নিকট এটা খুবই গুরুতর ও মারাত্মক বিষয়। এ দ্বিমুখীপনাও এ পর্যায়ের। আমাদের মধ্যে অনেকেই এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং এটা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে না। অথচ এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এটা কত গুরুতর ও মারাত্মক গুনাহ্ এবং আখেরাতে এর জন্য কি কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা এবং মিথ্যা ও প্রতারণা প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও আদর্শে যেসব সুন্দর চরিত্র ও সদগুণসমূহের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং যেগুলোকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন, এগুলোর মধ্যে সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি "কিতাবুল ঈমানে" উল্লেখ করে আসা হয়েছে যে, মিথ্যা বলা, আমানতে খেয়ানত করা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুনাফেকীর আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম

এবং যার মধ্যে এ দোষগুলোর সমন্বয় ঘটে, সে মুনাফেক। অনুরূপভাবে ঐ হাদীসটিও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যার মধ্যে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।" এ হাদীসটিও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, "মু'মিন ব্যক্তি মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হতে পারে না।"

এখন এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে তিনি সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে সরাসরি নির্দেশ করেছেন।

(١٩٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا * (رواه البخارى ومسلم)

১৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর এবং সর্বদা সত্য কথা বল। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যকেই অনুসন্ধান করে, তখন সে সিদ্দীকের স্তরে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাকে সিদ্দীক তথা মহাসত্যবাদী হিসাবে লিখে নেওয়া হয়।

আর তোমরা সর্বদা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ যখন মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মিথ্যাকে অবলম্বন করে নেয়, তখন এর ফল এই হয় যে, তাকে আল্লাহ্‌র কাছে মহামিথ্যুক হিসাবে লিখে দেওয়া হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, সত্য কথা বলা স্বয়ং একটি ভাল অভ্যাস। সাথে সাথে এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকেও ভাল প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয় এবং সত্য বলায় অভ্যস্ত মানুষ সিদ্দীকের স্তরে পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি ঘৃণিত স্বভাব। তাছাড়া এর একটি মন্দ প্রতিক্রিয়া এটাও যে, এটা মানুষের মধ্যে পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তার সম্পূর্ণ জীবনটাকে পাপাচারের জীবন বানিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। অধিকন্তু মিথ্যায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মহামিথ্যুকের স্তরে পৌঁছে একেবারে অভিশপ্ত হয়ে যায়।

(١٩٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَاائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৯৫। আব্দুর রহমান ইবনে আবী কুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওযূ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন তাঁর ওযূর পানি নিয়ে নিয়ে (নিজেদের মুখমণ্ডল ও শরীরে) মাখতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে এবং কোন্ আবেগ তোমাদের দ্বারা এ কাজ করিয়ে নিচ্ছে ? তাঁরা উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা।" তাঁদের এ উত্তর শুনে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলকে সে ভালবাসবে অথবা আল্লাহ্ ও রাসূল তাকে ভালবাসা দান করবেন, তার জন্য উচিত যে, সে যখনই কথা বলবে, সত্য বলবে, যখন তার কাছে কোন আমানত সমর্পণ করা হবে, তখন কোন প্রকার খেয়ানত ছাড়াই সে এটা আদায় করে দেবে, আর সে যার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্কের প্রথম দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলবে, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততাকে আপন নিদর্শন বানিয়ে নেবে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। যদি এটা না হয়, তাহলে ভালবাসার এ দাবী এক নিরর্থক দাবী ও এক ধরনের মুনাফেকী ছাড়া কিছুই নয়।

(١٩٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُّمْ وَاَدُّوْا اِذَائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৯৬। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা পূরণ করবে, যখন আমানত সমর্পণ করা হবে তখন ঠিকমত তা আদায় করে দেবে, নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজের চোখকে হেফাযত রাখবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিজের হাতকে ফিরিয়ে রাখবে। (অর্থাৎ, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে না, কষ্ট দেবে না এবং কারো মাল-সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে না।) —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈমান নিয়ে আসে এবং ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে, আর উল্লেখিত ছয়টি মৌলিক চরিত্রের প্রতিও পূর্ণ যত্নবান হয়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী হবে। তার জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা

(١٩٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ * (رواه الترمذى والدارمى والدار قطنى)

১৯৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী-রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। —তিরমিযী, দারেমী, দারাকুতনী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি স্পষ্টভাবে একথাও বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সুউচ্চ স্তর লাভ করার জন্যও দুনিয়া এবং দুনিয়ার কাজ-কারবার পরিত্যাগ করা জরুরী নয়; বরং একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা কেন্দ্রে বসে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিধি-বিধান পালন এবং সততা ও আমানতদারীর মত ধর্মীয় নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আখেরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পর্যন্ত লাভ করতে পারে।

(١٩٨) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَ صَدَقَ * (رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى)

১৯৮। উবায়েদ ইবনে রেফা'আ তার পিতা রেফা'আ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যবসায়ীদেরকে কেয়ামতের দিন পাপাচারী হিসাবে উঠানো হবে। (অর্থাৎ, সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পাপাচারীদের মত।) তবে ঐসব ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, পুণ্যপথের অনুসারী হয় এবং সত্য কথা বলে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী

মিথ্যা ও প্রতারণা ঈমানের পরিপন্থী

(١٩٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৯৯। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের চরিত্রে সবকিছুর অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যা তার মধ্যে থাকতে পারে না। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন ব্যক্তি যদি বাস্তবেই মু'মিন হয়, তাহলে তার চরিত্রে মিথ্যা ও প্রতারণার কোন ঠাঁই থাকতে পারে না। অন্যান্য দোষ ও দুর্বলতা তার মধ্যে থাকতে পারে; কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যার মত মুনাফেকসুলভ বিষয় ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে না।.অতএব, কারো মধ্যে যদি এসব মন্দ স্বভাব থাকে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে, ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ এখনও তার অর্জিত হয় নি। তাই সে যদি এ বঞ্চিত অবস্থায় নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে এসব ঈমানবিরোধী স্বভাব থেকে নিজের জীবনকে পবিত্র করে নিতে হবে।

মিথ্যার দুর্গন্ধ

(٢٠٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهِ * (رواه الترمذى)

২০০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশ্‌তা এ মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে এ জগতের জড় পদার্থসমূহে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, তেমনিভাবে ভাল ও মন্দ কর্ম এবং বাক্যসমূহেও সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, যা ফেরেশ্‌তারা ঠিক এভাবেই অনুভব করে, যেভাবে আমরা এখানকার সুগন্ধ ও দুর্গন্ধকে অনুভব করে থাকি। আর কোন কোন সময় আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দাও তা অনুভব করে নিতে পারে, যাদের আত্মিক শক্তি তাদের জৈবিক শক্তির উপর প্রবল হয়ে যায়।

একটি মারাত্মক প্রতারণা

(٢٠١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ * (رواه ابوداؤد)

২০১। সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বল, আর সে এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি এতে মিথ্যাবাদী। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মিথ্যা যদিও সর্বাবস্থায় গুনাহ্ এবং মারাত্মক গুনাহ্; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটা খুবই মারাত্মক ও সাংঘাতিক ধরনের পাপ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রের একটি হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করে, আর তুমি তার এ বিশ্বাস ও সুধারণা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটে তার সাথে মিথ্যা বল এবং প্রতারণা কর।

মিথ্যা সাক্ষ্য

(٢٠٢) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ * (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

২০২। খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করার সমান সাব্যস্ত করে দেওয়া

হয়েছে। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই ঃ "তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক— কেবল এক আল্লাহ্‌র হয়ে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করে।" —আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মিথ্যাই গুনাহ্; কিন্তু এর কোন কোন প্রকার ও কোন কোন ক্ষেত্র গুনাহ্‌র দিক দিয়ে খুবই গুরুতর। এগুলোর মধ্য থেকেই একটি ক্ষেত্র হচ্ছে কোন মামলা-মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন বান্দার ক্ষতি সাধন করা। সূরা হজ্জের উল্লেখিত আয়াতে মিথ্যার এ প্রকারটিকেই শিরক ও প্রতিমাপূজার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয়টি থেকে বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দেওয়ার জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মজীদের এ বর্ণনাভঙ্গীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য তার জঘন্যতা ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও অভিশাপ ডেকে আনার ক্ষেত্রে শিরকের সমতুল্য। কথাটি তিনি তিনবার বললেন এবং দাঁড়িয়ে এক বিশেষ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

তিরমিযী শরীফের অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন এবং তিনবার বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্‌গুলো ? তারপর বললেন ঃ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা। বর্ণনাকারী বলেন যে, প্রথমে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু পরে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং এ শেষ কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। শেষে আমরা বলতে লাগলাম, এবার যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন। অর্থাৎ, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটি বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছিল এবং তিনি এমন উত্তেজনার সাথে কথাটি বলছিলেন যে, আমরা অনুভব করছিলাম যে, তাঁর অন্তরে তখন একটি বিরাট বোঝা পড়ে আছে। তাই মন চাচ্ছিল যে, তিনি যদি এখন নীরব হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরে এ বোঝা না চাপাতেন।

মিথ্যা শপথ

(٢٠٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ * (رواه البخارى ومسلم)

২০৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করল, যাতে সে এর দ্বারা কোন মুসলমানের সম্পদ মেরে দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত থাকবেন। —বুখারী, মুসলিম

(٢٠٤) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ * (رواه مسلم)

২০৪। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে দিল, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত তার উপর হারাম করে দিবেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটা যদি কোন সামান্য জিনিসও হয় ? (অর্থাৎ, কেউ যদি কারো সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসও কসম খেয়ে মেরে দেয়, তাহলেও কি তার এ পরিণতি হবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, সেটা যদি বনজ পিলু বৃক্ষের একটি ডালও হয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, অতি সামান্য ও তুচ্ছ মানের কোন জিনিসও যদি কেউ কসম খেয়ে নিজের ভাগে নিয়ে নেয়, তাহলেও সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(٢٠٥) عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَطِعُ اَحَدٌ مَالًا بِيَمِيْنٍ اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ اَجْذَمُ * (رواه ابوداؤد)

২০৫। আশআছ ইবনে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারো সম্পদ মেরে দেয়, সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি হাদীসেই ঐ ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যে কোন মামলা ও বিচারে মিথ্যা কসম খেয়ে অন্য পক্ষের সম্পদ মেরে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বর্ণিত প্রথম হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন যখন তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে, তখন তার উপর আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ থাকবে। আবূ উমামা বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নামই তার আবাস হিসাবে অবধারিত। আর আশআছ ইবনে কায়েস বর্ণিত এ হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কুষ্ঠাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্র আশ্রয় চাই! কী ভীষণ এ শাস্তিত্রয়। আর এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তাই এ ব্যক্তি যদি এ বিরাট পাপ থেকে তওবা করে পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে না যায়, তাহলে এ হাদীসসমূহের চাহিদা এটাই যে, তার সামনে এসব শাস্তি আসবেই এবং এর সবগুলোই তাকে ভোগ করতে হবে।

বাস্তব সত্য এই যে, কোন বিচারকের আদালতে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এবং আল্লাহ্কে নিজের সাক্ষী বানিয়ে মিথ্যা বলা এবং কোন বান্দার সম্পদ মেরে খাওয়ার জন্য অথবা তাকে বেইজ্জতি করার জন্য আল্লাহ্র পবিত্র নাম ব্যবহার করা আসলেই এমন বিরাট গুনাহ্ যে, এর শাস্তি যত কঠিনই দেওয়া হোক, যথার্থ সেটাই।

(٢٠٦) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَنْظُرُ

اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَةً بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ * (رواه مسلم)

২০৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষ এমন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দয়াদৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো খুবই ব্যর্থ ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত! এরা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করে, (যেমন অহংকারী ও উদ্ধত লোকেরা করে থাকে।) উপকার করে যারা খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যারা নিজেদের পণ্য চালিয়ে দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে বিচারকের সামনে আদালতে কোন মামলায় মিথ্যা কসম খাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামের চরম অপব্যবহার, তেমনিভাবে নিজের পণ্য বিক্রির জন্য গ্রাহকের সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করাও আল্লাহ্র নামের চরম অপব্যবহার এবং নিতান্তই হীন কর্ম। এ জন্য এটাও মিথ্যার জঘন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং কেয়ামতের দিন এ ধরনের মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ী তার এ অপকর্মের দরুন আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলা, তাঁর দয়াদৃষ্টি লাভ এবং পাপমুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মিথ্যার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার

মিথ্যার কয়েকটি জঘন্য প্রকারের উল্লেখ তো উপরে করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন মিথ্যা এমনও হয়ে থাকে, যেগুলোকে অনেক মানুষ মিথ্যাই মনে করে না, অথচ এগুলোও মিথ্যারই অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকেও বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নের হাদীসগুলোতে মিথ্যার এ প্রকারের কিছুটা আলোচনা রয়েছে ঃ

(٢٠٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّىْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَاتَعَالِ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيَهٗ ؟ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيَهٗ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهٖ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ * (رواه ابوداؤد والبيهقى فى شعب الايمان)

২০৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের বাড়ীতে বসা ছিলেন, তখন আমার মা আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তাকে কি জিনিস দেওয়ার ইচ্ছা করেছ ? মা বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ মনে রেখো! একথা বলার পর তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লিখে দেওয়া হত। —আবূ দাউদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেননা, মুসলমানের জিহ্বা মিথ্যার দ্বারা কলুষিত হওয়াই চাই না। তাছাড়া এর একটি বিরাট রহস্য এই যে, পিতা-মাতা যদি সন্তানদের সাথে মিথ্যা বলে— যদিও এর উদ্দেশ্য কেবল মনোরঞ্জনই হোক, তবুও সন্তানরা তাদের কাছ থেকে মিথ্যা বলা শিখবে এবং মিথ্যা বলাকে তারা দোষের কিছু মনে করবে না।

(٢٠٨) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهٗ وَيْلٌ لَهٗ * (رواه احمد والترمذى وابوداؤد والدارمى)

২০৮। বাহ্য ইবনে হাকীম স্বীয় পিতার মাধ্যমে আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, তার উপর আক্ষেপ! তার উপর বড়ই আক্ষেপ! —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, শুধু মজলিসকে আনন্দ দান করার জন্য এবং হাসাহাসি করার জন্য মিথ্যা বলাও দোষের কথা ও খারাপ অভ্যাস। এতে যদিও কারো কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু প্রথমতঃ এর দ্বারা কথকের মুখ মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যার প্রতি ঈমানদার মানুষের অন্তরে যে ঘৃণা থাকা চাই, তা কমে যায়। আর তৃতীয় ক্ষতি এই যে, মানুষের মধ্যে মিথ্যা বলার সাহস বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা মিথ্যার প্রচলনে সহায়তা হয়।

(٢٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ * (رواه مسلم)

২০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের জন্য এতটুকু মিথ্যাই যথেষ্ট যে, সে যাই শুনে তাই বলে বেড়ায়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রত্যেক শোনা কথাই যাচাই বাছাই ছাড়া বলে বেড়ানোও এক পর্যায়ের মিথ্যা। যেভাবে জেনে বুঝে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য থাকে না, তেমনিভাবে এ ব্যক্তিও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যাহোক, মু'মিন ব্যক্তির উচিত, সে যেন এসব সূক্ষ্ম ধরনের মিথ্যা থেকেও নিজের রসনার হেফাযত করে।

প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার

যেভাবে মিথ্যার কোন কোন প্রকার এমন রয়েছে যে, মানুষ এগুলোকে মিথ্যাই মনে করে না, তেমনিভাবে খেয়ানতেরও এমন কিছু ধরন রয়েছে যেগুলোকে অনেক মানুষ খেয়ানত বলে গণ্য করে না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো সম্পর্কেও উম্মতকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। নিম্নে এ ধরনের কিছু হাদীস পাঠ করুন ঃ

(٢١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِى الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ * (رواه الترمذى)

২১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবুল হাইসামকে বলেছিলেন ঃ যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার কাছে যেন আমানত রাখা হয়। (তাই তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে।) —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান কোন এক ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, সে সময় তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। কথাটির অর্থ এই যে, যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত সে যেন একথা ভাবে যে, পরামর্শ গ্রহণকারী তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেই পরামর্শের জন্য তার কাছে এসেছে এবং নিজের একটি আমানত তার কাছে সমর্পণ করেছে। অতএব তার উচিত, সে যেন এ আমানতের হক আদায়ে ত্রুটি না করে। অর্থাৎ, সে যেন ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে পরামর্শ দেয় এবং বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা করে। যদি এমনটি না করে, তাহলে সে এক ধরনের খেয়ানতের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

(٢١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ * (رواه الترمذى وابوداؤد)

২১১। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন কথা কারো কাছে বলে, তারপর সে এদিক ওদিক তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়। —তিরমিযী, আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনার কাছে কোন কথা বলে এবং সে মৌখিকভাবে একথা নাও বলে যে, এটা অন্য কারো কাছে বলবেন না; কিন্তু তার কোন ভাব-ভঙ্গিতে যদি আপনি বুঝেন যে, সে এটা চায় না যে, কথাটি সাধারণের গোচরে আসুক, তাহলে তার এ কথাটি আমানত স্বরূপ থাকবে এবং আপনাকে আমানতের মতই এর হেফাযত করতে হবে। যদি এমন না করেন; বরং অন্যের কানে পৌঁছিয়ে দেন, তাহলে এটা আপনার পক্ষ থেকে আমানতে খেয়ানত হবে এবং এর জন্য আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

তবে অন্য এক হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কারো অন্যায় হত্যা বা তার মানহানি অথবা তার কোন আর্থিক ক্ষতির আশংকার কথা আপনি জানতে পারেন, তাহলে এটা কখনো গোপন রাখা যাবে না; বরং সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে। ঐ হাদীসটিও এখানে পড়ে নিন।

(٢١٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلَّا ثَلٰثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ اَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ اَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ * (رواه ابوداؤد)

২১২। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মজলিসসমূহ আমানতদারীর সাথে হওয়া চাই। (অর্থাৎ, কোন মজলিসে গোপনীয়তার সাথে যে পরামর্শ অথবা সিদ্ধান্ত হয়, মজলিসে উপস্থিত লোকজন যেন এটাকে আমানত মনে করে গোপন রাখে।) কিন্তু তিনটি মজলিসের বিধান এর ব্যতিক্রম। (১) যে মজলিসের সম্পর্ক কারো অন্যায় হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে থাকে। (২) যে মজলিসে কারো

সম্ভ্রমহানির পরামর্শ করা হয়। (৩) যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়ার সাথে থাকে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি বিষয়কে কেবল উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ্ ও অন্যায় কাজের ষড়যন্ত্র ও পরামর্শ হয়, আর তোমাকেও সেখানে শরীক রাখা হয়, তাহলে কখনো এটা গোপন রাখবে না; বরং এ অবস্থায় তোমার দ্বীনদারী ও আমানতদারীর দাবী এটাই হবে যে, গুনাহ্ ও অপকর্মের এ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য বিষয়টি যাদের গোচরে আনা তুমি জরুরী মনে কর, তাদেরকে অবশ্যই অবহিত করে দেবে। যদি এমনটি না কর, তাহলে আল্লাহ্র সাথেও খেয়ানত হবে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সাথেও।

বিবাদ ও ফেতনা দূর করার জন্য নিজের থেকে কিছু বলে দেওয়া মিথ্যার মধ্যে শামিল নয়

(٢١٣) عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا *(رواه البخارى ومسلم)

২১৩। উম্মে কুলসূম বিনতে উক্‌বা ইবনে আবী মুআইত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি কায়েম করতে গিয়ে (এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে) ভাল কিছু বলে এবং সদ্ভাব সৃষ্টি হয় এমন কথা আদান-প্রদান করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কখনো এমন হয় যে, দু'ব্যক্তি অথবা দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ বিবাদ ও ক্ষোভ। প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে নিজের শত্রু মনে করে এবং এর ফলে বিরাট বিরাট ফেতনা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো তো খুন-খারাবী এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটে যায় এবং শত্রুতার উত্তেজনায় উভয় পক্ষ থেকেই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে নিজের অধিকার মনে করা হয়। এ পরিস্থিতিতে যদি কোন কল্যাণকামী ও নিঃস্বার্থ বান্দা এ বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াসী হয় এবং সে এ প্রয়োজন অনুভব করে যে, এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের নিকট এমন হিতকামনামূলক কিছু কথাবার্তা পৌঁছানো দরকার, যার দ্বারা বিবাদ ও শত্রুতার আগুন নিভে যায় এবং সমঝোতা ও সুধারণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এ ধরনের কথা নিজে বানিয়ে বললেও এটা ঐ মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা অন্যায় ও কবীরা গুনাহ্।

এটাই হচ্ছে এ হাদীসের উদ্দেশ্য এবং এটাই হচ্ছে শেখ সা'দী শীরাযী (রহঃ)-এর এ কথার তাৎপর্য ঃ "বিভ্রান্তির সত্যের চেয়ে কল্যাণকর অসত্যও ভাল।"

ওয়াদা পূরণ ও ওয়াদা ভঙ্গ করা

প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা করে তা পূরণ করা আসলে সত্যবাদিতারই একটি ব্যবহারিক রূপ, আর ওয়াদা ভঙ্গ করা মিথ্যার একটি বাস্তব প্রতিফলন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নৈতিক শিক্ষায় ওয়াদাভঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার এবং সর্বদা ওয়াদা পূরণ করার ব্যাপারেও কঠোর তাকীদ দিয়েছেন।

মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে ঐ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর সঠিক অনুসরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি।" এগুলোর মধ্যে তিনি ওয়াদা পূরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন।

কিতাবুল ঈমানে বায়হাকীর বরাতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর ঐ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন করে না, দ্বীনের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।

এখানে এ ধারার আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(٢١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ * (رواه البخارى ومسلم)

২১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফেকের তিনটি নিদর্শন রয়েছে ঃ (১) যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে আমানত সমর্পণ করা হয়, তখন খেয়ানত করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রায় এ বিষয়েরই কাছাকাছি একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বরাতে কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো মুনাফেকের নিদর্শন হওয়ার অর্থ কি। সেখানকার আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, মিথ্যা, খেয়ানত ও ওয়াদা ভঙ্গ করা আসলে মুনাফেকের চরিত্র। যার মধ্যে এ মন্দ স্বভাবগুলো থাকবে, সে আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুনাফেক না হলেও কর্ম ও চরিত্রে মুনাফেক গণ্য হবে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ হাদীসেই এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত রয়েছে ঃ "সে ব্যক্তি যদি নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবীও করে, তবুও এ মন্দ স্বভাবগুলোর কারণে সে এক প্রকারের মুনাফেক। যাহোক, এ হাদীসে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর নিদর্শন ও মুনাফেকসুলভ স্বভাব বলা হয়েছে।

(٢١٥) عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِدَةُ دَيْنٌ * (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২১৫। হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওয়াদাও এক ধরনের ঋণ। (তাই এটা শোধ করতে হবে।) —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, কাউকে যদি কোন কিছু দেওয়ার বা তার প্রতি অনুগ্রহ করার অথবা এ প্রকার কোন ওয়াদা করা হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াদাকারীকে ভাবতে হবে যে, এটা আমার উপর ঋণ বিশেষ। তাই আমাকে তা শোধ করতে হবে।

তবে যদি কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা বা শরীঅতবিরোধী কোন কাজের অথবা এমন কাজের ওয়াদা করা হয়, যাতে অন্য কারো হক বিনষ্ট হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে ওয়াদা পূরণ

করা জরুরী হবে না; বরং এর বিপরীত করাই জরুরী হবে। এ ওয়াদা ভঙ্গ করায় কোন গুনাহ্ হবে না; বরং শরীঅতের অনুসরণের কারণে সওয়াব হবে।

(٢١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُّبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُّهُ اَنْ اٰتِيَهُ بِهَا فِىْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاِذَا هُوَ فِىْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلٰثٍ اَنْتَظِرُكَ * (رواه ابوداؤد)

২১৬। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল হামসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির আগে আমি একবার তাঁর সাথে বেচা-কেনার একটি কারবার করেছিলাম। (তারপর আমার যা কিছু দেয়ার ছিল, এর একটা অংশ তো তখনই পরিশোধ করে দিয়েছিলাম।) আর কিছু পরিশোধ করা বাকী ছিল। আমি কথা দিয়েছিলাম যে, তিনি যেখানে আছেন সেখানেই তা নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি এ ওয়াদার কথা ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হল। (আমি তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এসে দেখি,) তিনি সেখানেই আছেন। তিনি (তখন কেবল এতটুকু) বললেন ঃ তুমি আমাকে বড় সমস্যায় ফেলে দিলে, আমি এখানে তিন দিন যাবত তোমার অপেক্ষায় আছি। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ নবুওয়ত লাভের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এতটুকু যত্নবান ছিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত এক জায়গায় অবস্থান করে এক ব্যক্তির অপেক্ষা করছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে এ পর্যায়ের কষ্ট ভোগ করা শরীঅতের দৃষ্টিতে সবসময় অপরিহার্য নয়। (যেমন, পরবর্তী হাদীস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা যাবে।) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে "মহত্তম চরিত্র" দান করে রেখেছিলেন, এ ছিল তারই ফল।

(٢١٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَاْتِ اَحَدُهُمَا اِلٰى وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ * (رواه رزين)

২১৭। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো সাথে (কোন স্থানে এসে সাক্ষাত করার) ওয়াদা করল, তারপর (পরবর্তী) নামাযের সময় পর্যন্ত তাদের একজন আসল না। (আর অপরজন নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকল এবং নামাযের সময় হয়ে গেল।) তখন উপস্থিত লোকটি নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে চলে গেল। এমতাবস্থায় তার উপর কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। —রযীন

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন এ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল এবং নির্দিষ্ট কিছু সময় অন্য জনের অপেক্ষাও করল, তখন সে নিজের দায়িত্ব পালন করে নিল। এখন যদি নামাযের সময় এসে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে সে এখান

থেকে চলে যায়, তাহলে তার উপর ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ আসবে না এবং সে গুনাহ্গার হবে না।

(٢١٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَّفِيَ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

২১৮। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন স্থানে আসার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তার নিয়্যত এটাই ছিল যে, সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, কিন্তু (বাস্তব কোন কারণে) সে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসতে পারল না, এতে তার উপর কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। —আবূ দাউদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ওয়াদা করে এবং তার নিয়্যত এটা পূরণ করারই থাকে, কিন্তু কোন কারণে নিজের ওয়াদা পূরণ করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ্র নিকট সে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু নিয়্যতই যদি এ থাকে যে, সে ওয়াদা পূরণ করবে না; তাহলে এটা এক ধরনের প্রতারণা হবে এবং এ জন্য সে নিঃসন্দেহে গুনাহ্গার হবে।

বিনয়-নম্রতা ও গর্ব-অহংকার

বিনয় ও নম্রতা ঐসব সদগুণের অন্যতম, কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর প্রতি সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং এসবের প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ হচ্ছে বান্দা। আর বান্দার সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব এটাই যে, তার প্রতিটি কর্মে দাসত্ব ও বিনয় ফুটে উঠবে। বস্তুতঃ বিনয় ও নম্রতা দাসত্বেরই পরিচায়ক। পক্ষান্তরে অহংকার ও গর্ব হচ্ছে বড়ত্ব ও প্রভুত্বের দাবী। এ জন্যই এটা বান্দাসুলভ আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভনীয়।

(٢١٩) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَفْخَرْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ * (رواه ابوداؤد)

২১৯। আয়ায ইবনে হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর, যার ফল এই হওয়া চাই যে, কেউ কারো উপর অবিচার করবে না এবং কেউ কারো উপর অহংকার করবে না। —আবূ দাউদ

(٢٢٠) عَنْ عُمَرَ رضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২২০। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকসকল! তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে) বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। যার ফলে, সে নিজের দৃষ্টিতে তো ছোট থাকে; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে হয় মহান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকারী হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। যার ফলে, সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যায়— যদিও নিজের ধারণায় সে অনেক বড়। এমনকি মানুষের চোখে সে কুকুর কিংবা শূকরের চেয়েও ঘৃণিত ও হীন হয়ে যায়। —বায়হাকী

(٢٢١) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ * (رواه ا لبخارى ومسلم)

২২১। হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, বেহেশতী মানুষ কারা ? প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে (ব্যবহার ও আচরণে গর্বিত ও কঠোর নয়; বরং) অক্ষম ও দুর্বলদের মত আচরণ করে এবং এ জন্য মানুষ তাকে দুর্বল ভাবে। (আর আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক এ পর্যায়ের যে,) সে যদি আল্লাহ্‌র উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে তিনি তা পূরণ করে দেখান। আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, জাহান্নামী কারা ? প্রত্যেক কঠোর-স্বভাব, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ব্যক্তি। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে "দুর্বল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ ঐ দুর্বলতা নয়, যা শক্তি ও সাহসের বিপরীতে বলা হয়ে থাকে। কেননা, ঐ দুর্বলতা কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং এক হাদীসে তো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ "শক্তিমান মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মুসলমানের চেয়ে অনেক উত্তম ও প্রিয়।" তাই এখানে দুর্বল দ্বারা ঐ ভদ্র, বিনয়ী ও কোমল স্বভাব মানুষ উদ্দেশ্য, যে লেনদেন ও আচার আচরণে শক্তিহীন ও দুর্বলদের মত অন্যের সামনে দমে যায় এবং এ কারণে মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে এবং দাবিয়ে রাখে। (অনুবাদের মধ্যেও এ অর্থটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।) এ জন্যই এ হাদীসে দুর্বলের বিপরীতে কঠোর-স্বভাব, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (শক্তিশালী ও সক্ষম নয়।) যাহোক, হাদীসের সারকথা এই যে, বিনয় ও নম্রতা জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য, আর অহংকার ও ঔদ্ধত্য জাহান্নামীদের চরিত্র।

এ হাদীসে জান্নাতী মানুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কসম পূর্ণ করে দেন। বাহ্যতঃ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে ইশারা করেছেন যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য নিজের আত্মগর্বকে মিটিয়ে দিয়ে তাঁর বান্দাদের সাথে বিনয় ও নম্রতার ভূমিকা পালন করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে এত নৈকট্যশীল হয়ে যায় যে, সে যদি কসম খেয়ে ফেলে, এ ব্যাপারটি এমনই হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার এ

কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং তার কথা বাস্তবায়ন করে দেখান। অথবা অর্থ এই যে, তারা যদি কোন বিশেষ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে কসম দিয়ে কোন বিশেষ দো'আ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ অবশ্যই কবূল করেন।

(٢٢٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২২২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে ঐ মহান সত্তার হক, যার হাতে রয়েছে সবার জীবন-মৃত্যু এবং সম্মান ও অসম্মান। যে সত্তার কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ তাঁর জন্যই রয়েছে বড়ত্ব ও গৌরব আসমান ও যমীনে। আর তিনিই পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত-৩৭)

অতএব, এখন যে বিভ্রান্ত মানুষটি গৌরব ও বড়ত্বের দাবীদার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে অহংকার ও প্রভুসুলভ আচরণ করে, সে যেন নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এ জন্য সে বড়ই অপরাধী এবং তার অপরাধ খুবই মারাত্মক। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, এ ফেরআউনী স্বভাবের কারণে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এ মৌলিক কথাটি আগেই সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব হাদীসে কোন খারাপ কর্ম অথবা মন্দ স্বভাবের পরিণতি এই বলা হয় যে, এতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, এগুলোর মর্ম সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, এ খারাপ কর্ম অথবা মন্দ স্বভাব তার নিজস্ব প্রভাবের দিক দিয়ে মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে এবং জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। অথবা এ অর্থ হয় যে, এগুলোতে লিপ্ত মানুষ খাঁটি ঈমানদারদের সাথে এবং তাদের মত সহজে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে নিতে হবে। এ জন্য এ হাদীসটির মর্মও ঐ মূলনীতির আলোকে এটাই বুঝতে হবে যে, অহংকার ও গৌরব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিতকারী এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী একটি স্বভাব। অথবা অর্থ এই যে, অহংকারী ও আত্মগৌরবে লিপ্ত ব্যক্তি সরাসরি জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং জাহান্নামে তাকে এ অহংকারের শাস্তি ভোগ করে নিতে হবে। জাহান্নামের আগুনে যখন তার অহংকার জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং অহংকারের ময়লা থেকে তাকে পাক-পবিত্র করে নেওয়া হবে, তখন সে যদি ঈমানদার হয়, তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে।

(٢٢٣) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ — وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ — وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ * (رواه مسلم)

২২৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষ রয়েছে, যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের প্রতি তিনি দৃষ্টিও দেবেন না। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক, (৩) অহংকারী দরিদ্র। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক গুনাহ্ নিজস্ব বিবেচনায়ই মারাত্মক ও কবীরা গুনাহ্ হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এবং বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যদি এটা প্রকাশ পায়, তাহলে খুবই মারাত্মক ও চরম আকার ধারণ করে। যেমন, চুরি নিজস্ব বিবেচনায়ই বড় পাপ; কিন্তু চোর যদি ধনী হয় যার চুরি করার কোন প্রয়োজন নেই অথবা সরকারী কর্মকর্তা, সৈনিক বা নিরাপত্তা প্রহরী হয়, তাহলে তার চুরি করা আরো মারাত্মক অপরাধ হবে এবং তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা হবে না।

এ হাদীসে এ ধরনেরই তিন অপরাধীর বেলায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ হতভাগাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর আখেরাতে এ অপরাধীরা দয়াময় প্রভুর কৃপাদৃষ্টি থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে। এরা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও নিঃস্ব অহংকারী। এটা এ জন্য যে, যৌবনকালে যদি কোন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এটা মারাত্মক কবীরা গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত তওবার দ্বারা সে ক্ষমাযোগ্যও হতে পারে। কেননা, যৌবনে কামভাবের কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়া তথা দুর্ভাগ্য বশত প্রকৃতিগত দুর্বলতার শিকার হওয়ার একটা বোধগম্য কারণ থাকে। কিন্তু কোন বৃদ্ধ যদি বৃদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম নষ্টামির পরিচায়ক। অনুরূপভাবে যদি কোন সাধারণ মানুষ নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা কথা বলে ফেলে, তাহলে তার এ গুনাহ্ও কবীরা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষমতাসীন শাসক যদি মিথ্যা বলে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম অধঃপতন ও তার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় না থাকার প্রমাণ সাব্যস্ত হবে। ঠিক তদ্রূপ যদি কোন সম্পদশালী ব্যক্তি অহংকার করে, তাহলে মানুষের সাধারণ স্বভাবের বিবেচনায় এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, অর্থের গৌরবে মানুষ এমনটি করতেও পারে। কিন্তু ঘরে খাবার নেই, এ অবস্থা সত্ত্বেও যদি কেউ অহংকার প্রদর্শন করে বেড়ায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা তার চরম হীনতা ও নীচতা বলেই গণ্য হবে। মোটকথা, এ তিন ধরনের অপরাধীরাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য, তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ ও পবিত্রকরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। পবিত্র না করার অর্থ বাহ্যতঃ এই যে, তাদের গুনাহ্ মাফ করা হবে না এবং কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও অন্যান্য নেক আমলের ভিত্তিতে তাদেরকে পুণ্যবান মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না; বরং শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। সর্বোপরি, সব বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

শরম ও লজ্জাশীলতা

শরম ও লজ্জা এমন একটি স্বভাবজাত ও মৌলিক সদগুণ, মানুষের চরিত্র গঠনে যার বিরাট দখল ও প্রভাব রয়েছে। এটাই ঐ গুণ ও চরিত্র যা মানুষকে অনেক মন্দ কাজ থেকে ও মন্দ কথা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এটা মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং ভাল ও ভদ্রোচিত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এক কথায় শরম ও লজ্জা মানুষের অনেক

সৌন্দর্যের মূল এবং অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে রক্ষাকারী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও দীক্ষা কার্যক্রমে এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন এবং নিজের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি ও তা আরো উন্নীত করতে সচেষ্ট হোন।

(٢٢٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ * (رواه مالك مرسلا ورواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان عن انس وابن عباس)

২২৪। যায়েদ ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ধর্মের একটা বিশেষ গুণ থাকে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ গুণ হচ্ছে লজ্জাশীলতা। —মোয়াত্তা মালেক, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক ধর্ম ও শরীঅতে মানুষের চরিত্রের কোন একটি বিশেষ দিকের উপর তুলনামূলকভাবে অধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে এবং মানব জীবনে সেটাকেই ফুটিয়ে তোলার এবং প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও তাঁর আনীত শরীঅতে নম্র-চিত্ততা ও ক্ষমার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। (এমনকি ঈসা [আঃ]-এর শিক্ষা ও দর্শনের যে কোন পাঠক স্পষ্টতঃই অনুভব করবে যে, নম্রচিত্ততা এবং ক্ষমাই যেন তাঁর শরীঅতের মূল বিষয় ও প্রাণ।) অনুরূপভাবে ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীঅতে লজ্জাশীলতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও জেনে নিতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় লজ্জাশীলতার মর্ম খুবই ব্যাপক। আমাদের পরিভাষায় তো লজ্জার দাবী এতটুকুই মনে করা হয় যে, মানুষ অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ, লজ্জাজনক কথাবার্তা এবং লজ্জাজনক কর্ম পরিহার করে চলবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, লজ্জা মানব চরিত্রের ঐ বিশেষ অবস্থার নাম, যার বর্তমানে একজন মানুষ কোন অশোভনীয় কাজ ও বিষয়ে লিপ্ত হতে সংকোচবোধ করে এবং এর দ্বারা তার কষ্ট হয়। কুরআন-হাদীস দ্বারাই এটাও জানা যায় যে, লজ্জার সম্পর্ক কেবল মানব সমাজের সাথেই নয়; বরং লজ্জার সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছেন ঐ মহান খালেক ও মালেক, যিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যার প্রতিপালন-প্রক্রিয়া থেকে মানুষ প্রতি মুহূর্ত অংশ পেয়ে চলেছে। আর যার দৃষ্টি থেকে তার কোন কাজ ও অবস্থা গোপন নয়।

বিষয়টি এভাবেও বুঝে নেওয়া যায় যে, লজ্জাশীল মানুষের সবচেয়ে বেশী লজ্জা হয়ে থাকে নিজের পিতা মাতা, নিজের উপকারকারী ও বড়দের প্রতি। আর একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব বড়দের চাইতে বড় এবং সকল উপকারকারীর বড় উপকারকারী। তাই একজন বান্দার সবচেয়ে বেশী লজ্জা তাঁর প্রতিই হওয়া উচিত। আর এ লজ্জার দাবী এই হবে যে, যে কাজ ও যে বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ও তাঁর বিধানের খেলাফ হবে, মানুষের মন নিজে নিজেই এ বিষয়ে সংকোচ ও মর্মপীড়া অনুভব করবে এবং সে এ থেকে বিরত থাকবে। কোন

বান্দার মনের অবস্থা যখন এমন হয়ে যাবে, তখন তার জীবন কত পবিত্র ও তার চরিত্র কেমন সুন্দর আর আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী হয়ে যাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(٢٢٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ * (رواه البخارى ومسلم)

২২৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক আনুসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিচ্ছিল এবং ভর্ৎসনা করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ একে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা তো ঈমানের অঙ্গ। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা শরম ও লজ্জার গুণ বিশেষভাবে দান করেছিলেন। যার ফলে সে নিজের কায়-কারবারে খুব নরম ছিল, কঠোরতার সাথে মানুষের কাছে নিজের অধিকারের দাবীও করতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এ লজ্জার কারণে মুখ খুলে কথাও বলতে পারত না— যেমন সাধারণভাবে লজ্জাশীল মানুষের অবস্থা হয়ে থাকে। অপর দিকে তার এক ভাই ছিল, যে তার এ অবস্থা ও রীতিনীতি পছন্দ করত না। একদিন এ ভাই তার ঐ লজ্জাশীল ভাইকে এ বিষয়ের উপর ভর্ৎসনা করছিল যে, তুমি এত লজ্জা কেন কর ? এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দুই ভাইয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে তিরস্কারকারী ভাইকে বললেন ঃ তোমার এ ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তার এ অবস্থাটি তো খুবই কল্যাণময়। শরম ও লজ্জা তো ঈমানের একটি শাখা অথবা ঈমানের ফল। এর কারণে যদি দুনিয়ার স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্ণও হয়ে যায়, আখেরাতে তো এর মর্যাদা অনেক।

(٢٢٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ * (رواه احمد والترمذى)

২২৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা ঈমানের একটি শাখা (অথবা ঈমানের ফল।) আর ঈমানের স্থান হচ্ছে জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। আর দুশ্চরিত্রতা জাহান্নামে নিয়ে যায়। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসেও যে বলা হয়েছে, "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ" বাহ্যতঃ এর মর্ম এই যে, লজ্জা ও শরম ঈমান বৃক্ষের বিশেষ শাখা অথবা এর ফল। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় (যা কিতাবুল ঈমানে এসেছে,) বলা হয়েছে, লজ্জা ঈমানেরই একটি শাখা। যাহোক, লজ্জা ও ঈমানের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আর এগুলো সবই এর বিভিন্ন শিরোনাম। এর আরেকটি শিরোনাম এটিও, যা পরের হাদীসটিতে আসছে।

(٢٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرِنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা ও ঈমান সর্বদা একত্রে একসাথে থাকে। যখন এর একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন দ্বিতীয়টিকেও উঠিয়ে নেওয়া হয়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমান এবং লজ্জার মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন সম্প্রদায় থেকে যদি এ দু'টির একটি উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিও বিদায় নিয়ে যায়। মোটকথা, কোন ব্যক্তি অথবা কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লজ্জা ও ঈমান হয়তো উভয়টিই থাকবে, অথবা দু'টির একটিও থাকবে না।

(٢٢٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لَا يَاْتِيْ اِلَّا بِخَيْرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২২৮। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা কেবল কল্যাণকেই ডেকে আনে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় স্থূল দৃষ্টিতে এ সন্দেহ হয় যে, লজ্জার কারণে মানুষের কখনো কখনো ক্ষতিও হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ সন্দেহটিরই অপনোদন করেছেন। হাদীসটির মর্ম এই যে, শরম ও লজ্জার ফলে কখনো কোন ক্ষতি হয় না; বরং সর্বদা লাভই হয়ে থাকে। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের স্থূলদৃষ্টিতে ক্ষতির বিভ্রম হয়, সেখানেও যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ক্ষতির স্থলে লাভই লাভ দেখা যাবে।

এখানে কোন কোন মানুষের মনে আরো একটি সংশয় সৃষ্টি হয় যে, শরম ও লজ্জার আধিক্য কখনো কখনো দ্বীনী কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে যায়। যেমন, যে ব্যক্তির মধ্যে শরম ও লজ্জার মাত্রা বেশী থাকে, সে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালনে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে উপদেশ দানে এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানেও দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়। কেননা, মানুষের প্রকৃতির যে অবস্থাটি এ ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে প্রতিবন্ধক হয়, এটা প্রকৃতপক্ষে লজ্জা নয়; বরং এটা মানুষের একটা সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত দুর্বলতা। অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে এবং লজ্জার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

(٢٢٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ * (رواه البخارى)

২২৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবুওয়তের বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে, এর

মধ্যে একটি বাণী এই ঃ যখন তুমি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সম্পূর্ণ শিক্ষা যদিও সংরক্ষিত নয়; কিন্তু তাদের কিছু সত্য ও বাস্তব উক্তি প্রবাদ বাক্যের মত সাধারণ্যে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে, হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সেগুলো সংরক্ষিত ও মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আছে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি শিক্ষা এটিও, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত প্রবাদ বাক্যের মত মানুষের মুখে উচ্চারিত ছিল। উক্তিটি হচ্ছে ঃ যখন লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার। ফারসী ভাষায়ও প্রবাদটি এভাবে চালু আছে ঃ নির্লজ্জ হয়ে যাও, যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সত্যায়ন করেছেন যে, এ উপদেশমূলক উক্তিটি পূর্ববর্তী নবুওয়তের শিক্ষারই অংশ।

(٢٣٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ * (رواه الترمذى)

২৩০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে এভাবে লজ্জা কর, যেভাবে লজ্জা করা উচিত। আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র শোকর যে, আমরা আল্লাহ্কে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, এটা নয়। (অর্থাৎ, লজ্জার অর্থ এত সীমাবদ্ধ নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) বরং আল্লাহ্কে যথার্থ লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কে যেসব চিন্তার উদয় হয়, এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমার পেট এবং পেটের ভিতর যা প্রবেশ করে, এর প্রতি খেয়াল রাখবে। (অর্থাৎ, কুচিন্তা থেকে মন-মস্তিষ্ককে এবং হারাম ও নাজায়েয খাদ্য থেকে পেটকে হেফাযত করবে।) মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কবরে যে অবস্থা হবে সেটা স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য পরিত্যাগ করে আখেরাতকেই দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেবে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলো করে নিল, সে-ই আল্লাহ্কে যথার্থ লজ্জা করল। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ প্রসঙ্গের প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় লজ্জার অর্থের ব্যাপকতার দিকে যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তিরমিযী শরীফের এ হাদীস দ্বারা কেবল এর সমর্থনই পাওয়া যায় না; বরং অধিকন্তু এর স্পষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। তাছাড়া হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা একটি মৌলিক কথা এও জানা গেল যে, আল্লাহ্কে যথার্থভাবে লজ্জা করার দাবী সে বান্দারাই করতে পারে, যাদের দৃষ্টিতে এ জগত এবং এর ভোগ-বিলাসের কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে

পশ্চাতে রেখে আখেরাতকে নিজেদের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিয়েছে। যারা মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থানসমূহের কথা সর্বদা স্মরণ রাখে। আর যার মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে না, সে যত কথাই বলুক, এ হাদীসের দৃষ্টিতে এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে আল্লাহ্‌কে লজ্জা করার যথার্থ হক আদায় করে নাই।

অল্পেতুষ্টি ও লোভ-লালসা

যেসব সদগুণের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র এবং এ দুনিয়াতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং অন্তরের অস্থিরতা ও মনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, এগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে অল্পেতুষ্টি। অল্পেতুষ্টির মর্ম এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা পাবে, তার উপরই সন্তুষ্ট ও খুশী থাকবে এবং বেশী পাওয়ার লোভ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে অল্পেতুষ্টির এ সম্পদ দান করেন, তাকে মনে করতে হবে যে, নিঃসন্দেহে আমাকে বিরাট সম্পদ ও নেয়ামত দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বাণী নিম্নে পাঠ করুন ঃ

(٢٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ * (رواه مسلم)

২৩১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ বান্দা সফলকাম, প্রকৃত অর্থেই যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক বা জীবনোপকরণও তাকে প্রদান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ পরিমিত রিযিকের উপর তুষ্টও করে দিয়েছেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে বান্দার ভাগ্যে ঈমানের মহাসম্পদ জুটে যায় এবং এর সাথে সে এ দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও পেয়ে যায়, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অল্পেতুষ্টির গুণও দান করে দেন, তাহলে তার জীবন বড়ই ধন্য ও খুবই সুখের। এ অল্পেতুষ্টি ও মনের প্রশান্তি এমন পরশমণি, যার দ্বারা নিঃস্বের জীবন রাজা-বাদশাহদের জীবনের চাইতেও বেশী স্বাদপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে যায়। এ পরশমণি একজন মিসকীনকে ধনীর চেয়েও ধনী বানিয়ে দেয়।

মানুষের কাছে যদি সম্পদের পাহাড়ও থাকে, কিন্তু তার মধ্যে আরো বেশী পাওয়ার লোভ থাকে এবং সে এতে আরো বৃদ্ধি ঘটানোর চিন্তা ও চেষ্টায় লেগে থাকে, আর আরো চাই-আরো চাই, এর নেশায় পড়ে থাকে, তাহলে অন্তরের প্রশান্তি তার কখনো লাভ হবে না এবং সে অন্তরের দিক দিয়ে দীনতায়ই পড়ে থাকবে। পক্ষান্তরে কোন মানুষের কাছে যদি কেবল জীবন ধারণ করার মত সামান্য উপকরণ থাকে, কিন্তু সে এতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে দারিদ্র্য ও অভাব সত্ত্বেও সে অন্তরের দিক দিয়ে ধনী থাকবে এবং তার জীবন বড়ই তৃপ্তি ও স্বস্তির জীবন হবে। এ সত্যটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে এ শব্দমালায় বর্ণনা করেছেন ঃ

(٢٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ * (رواه البخارى)

২৩২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদের প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হওয়া যায় না; বরং ধনী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অন্তরের পরিতৃপ্তি তথা অমুখাপেক্ষিতা। —বুখারী

এ বাস্তব সত্যটি আরো স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে এভাবে বুঝিয়েছিলেন ঃ

(٢٣٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَقُوْلُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنٰى قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ تَقُوْلُ قِلَّةُ الْمَالِ الْفَقْرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ الْغِنٰى فِى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِى الْقَلْبِ * (رواه الطبرانى فى الكبير)

২৩৩। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি কি মনে কর যে, সম্পদ বেশী হওয়ার নামই ধনী হওয়া ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। (এমনই তো মনে করা হয়।) তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনে কর যে, সম্পদ কম হওয়ার অর্থই দরিদ্রতা ? আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। (তাই তো মনে করা হয়।) কথাটি তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন ঃ প্রকৃত ঐশ্বর্য মনের মধ্যে থাকে, আর প্রকৃত দৈন্যও মনের মধ্যে থাকে। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ বাস্তব সত্য এটাই যে, ধনী হওয়া, গরীব হওয়া এবং সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার সম্পর্ক টাকা পয়সার চেয়ে মানুষের অন্তরের সাথে বেশী থাকে। অন্তর যদি ধনী ও অমুখাপেক্ষী থাকে, তাহলে মানুষ নিশ্চিন্ত ও সুখী। পক্ষান্তরে অন্তর যদি লোভ-লালসার শিকার হয়, তাহলে সম্পদের স্তূপের মধ্যে পড়ে থেকেও সে সুখ থেকে বঞ্চিত এবং অভাবগ্রস্ত। শেখ সা'দী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে ঃ মানুষ ধনী হয় অন্তরের দ্বারা সম্পদের দ্বারা নয়। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার একটি কবিতাংশের উল্লেখ খুবই সমীচীন বোধ হবে। জনৈক কবি বলেন, "ধনের, গৌরব যার মিছে অহমিকা, মনের ঐশ্বর্য বিনে সবি তার ফাঁকা।" অনুবাদক

(٢٣٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ * (رواه ابوداؤد)

২৩৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইল। তিনি তাদেরকে দিলেন। (কিন্তু তাদের চাওয়া শেষ হল না।) তাই তারা আবার চাইল এবং তিনি আবারো দিলেন। পরিশেষে যখন তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমার কাছে যে অর্থ-সম্পদ আসবে, তা তোমাদেরকে না দিয়ে আমি সঞ্চিত রাখব

না; (বরং তোমাদেরকে দিতেই থাকব। কিন্তু এ কথাটি ভালভাবে বুঝে নাও যে, এভাবে সওয়াল করে করে অর্থ উপার্জন করলে সচ্ছলতা ও সুখের জীবন আসবে না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম হচ্ছে এই যে,) যে ব্যক্তি নিজে সওয়ালবিমুখ হয়ে থাকতে চায়, (অর্থাৎ, কারো সামনে হাত পাতা থেকে বাঁচতে চায়,) আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করেন এবং সওয়ালের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন কঠিন ক্ষেত্রে নিজের মনকে শক্ত করে ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছবর ও ধৈর্যের তওফীক দান করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল কোন নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয় নাই। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির বিশেষ শিক্ষা ও আবেদন এই যে, কোন বান্দা যদি চায় যে, সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না এবং কারো সামনে হাত পাতবে না এবং বিপদে সে টলবে না, তাহলে তার জন্য উচিত সে যেন নিজের সাধ্য অনুযায়ী এ ভাবেই চলতে চেষ্টা করে। সে যদি এমন করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করবেন এবং এসব কিছুই তার ভাগ্যে জুটবে।

হাদীসটির শেষ অংশে বলা হয়েছে, "কোন বান্দাকে ছবর ও ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল কোন নেয়ামত দান করা হয় নাই।" বাস্তব সত্য এটাই যে, ছবর ও ধৈর্য অন্তরের যে অবস্থাটির নাম সেটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল ও বিরাট নেয়ামত। এ জন্য কুরআন মজীদে "তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর" এ বাণীতে ধৈর্যকে নামাযের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(٢٣٥) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهٗ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهٗ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهٗ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهٗ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا *

(رواه البخارى ومسلم)

২৩৫। হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সম্পদ চাইলাম। তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবার চাইলাম। এবারও তিনি দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে হাকীম! এ মাল-সম্পদ সবার কাছেই বড় আকর্ষণীয় এবং মিষ্ট বস্তু। অতএব, যে ব্যক্তি এটা লোভ-লালসা ছাড়া উদার চিত্তে গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি মনের লোভে এটা গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা ঐ ক্ষুধাকাতর রোগীর মত হবে, যে খুব খায়; কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম ইবনে হেযাম বলেন ঃ (হুযূর [সাঃ]-এর এ উপদেশবাণী শুনে) আমি নিবেদন

করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি আপনার পরে মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করব না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেরই বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হাকীম ইবনে হেযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তিনি এভাবে রক্ষা করেছিলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং ওমর ফারুক (রাঃ) নিজেদের খেলাফতকালে যখন সবাইকে ভাতা প্রদান করতেন, তখন তাকেও বার বার ভাতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হননি।

"ফতহুল বারী" গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার "মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই"-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম দুই খলীফার পর হযরত ওসমান ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত ও শাসনকালেও তিনি কখনো কোন ভাতা অথবা অনুদান গ্রহণ করেননি। এভাবেই তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে ১২০ বছর বয়সে ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(٢٣٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا * (رواه ابوداؤد)

২৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দিলেন এবং এতে বললেন ঃ তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ এ লোভের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ লোভই তাদেরকে কৃপণতা করতে বলেছে। ফলে তারা কৃপণতা অবলম্বন করেছে। এটাই তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, আর তারা তাই করেছে। এ জিনিসই তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে বলেছে, আর তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, লোভ-লালসা কেবল একটি মন্দ স্বভাবই নয়; বরং এর কারণে মানুষের জীবনে অন্যান্য ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত সমাজ ও জাতিকে ডুবিয়ে ছাড়ে। এ জন্য মুসলমানদের উচিত, তারা যেন এ ভয়াবহ ও ধ্বংসকর মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করে।

(٢٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ * (رواه ابوداؤد)

২৩৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছে অতি লোভ ও চরম ভীরুতা। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এটা এক বাস্তব সত্য যে, লোভী ও লালসাপ্রবণ মানুষ সবসময় এ চিন্তায় অস্থির ও উৎকণ্ঠিত থাকে যে, এটা পাই নাই, ওটা পাই নাই, অমুকের কাছে এটা আছে, আমার কাছে এটা নেই। অনুরূপভাবে অধিক ভীরু মানুষ অহেতুক ও কাল্পনিক আশংকায় সর্বদা বিচলিত থাকে এবং তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভাগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরের এ দু'টি অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। আর বাস্তবেও এগুলো সবচেয়ে মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাব।

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

এ দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্টও আছে, আরাম এবং সুখও আছে। আনন্দও আছে, দুশ্চিন্তাও আছে। মিষ্টতাও আছে, তিক্ততাও আছে। ঠাণ্ডাও আছে, গরমও আছে। অনুকূল অবস্থাও আছে, প্রতিকূলতাও আছে। আর এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এবং তাঁরই হুকুমে হয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের অবস্থা এই হওয়া চাই যে, যখন কোন দুঃখ-মুসীবত এসে যায়, তখন তারা যেন নৈরাশ্যের শিকার হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে; বরং ঈমানী ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তা যেন বরণ করে নেয় এবং অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি আমাদের প্রজ্ঞাময় ও দয়াময় প্রভু এবং তিনিই আমাদেরকে এ দুঃখ ও বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী।

অনুরূপভাবে যখন মানুষের অবস্থা অনুকূল ও যুৎসই থাকে, তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে থাকে এবং সুখ ও আনন্দের সামগ্রী হাতে আসতে থাকে, তখনও যেন তারা এটাকে নিজেদের কৃতিত্ব এবং নিজেদের বাহুবলে অর্জিত ফসল মনে না করে; বরং এ সময় তারা যেন নিজেদের অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও তাঁর দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর দেওয়া সব নেয়ামত ছিনিয়েও নিতে পারেন। এ জন্য প্রতিটি নেয়ামতের উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

এটা ইসলামের এক বিশেষ শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে এর প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এ শিক্ষার উপর আমল করার একটি ফল তো এই হয় যে, একজন বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে। দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, সে বিপদে ও ব্যর্থতায় কখনো ভেঙ্গে পড়ে না, অব্যাহত দুঃখ ও শোকে সে মুষড়ে যায় না এবং নৈরাশ্য ও ভঙ্গুরতা তার কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(٢٣٨) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِالْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ * (رواه مسلم)

২৩৮। হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন বান্দার ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি ব্যাপার ও প্রত্যেকটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। আর এমনটি মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য হয় না। তার জীবনে

যদি সুখ ও আনন্দ আসে, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণই কল্যাণ। তার জীবনে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট আসে, তাহলে সে এতে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ার দুঃখ ও শান্তি তো সবার জীবনেই আসে; কিন্তু এ কষ্ট ও সুখের দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ কেবল ঐসব ঈমানদারদের ভাগ্যে জুটে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে যে, তারা সুখ, শান্তি ও আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বান্দাসুলভ অবস্থা নিয়ে তারা ধৈর্য ধারণ করে। যেহেতু সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ ও বিষাদ থেকে মানুষের জীবন কখনো মুক্ত থাকে না, এজন্য আল্লাহ্‌র এসব বান্দার অন্তরও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে সর্বদা পূর্ণ থাকে।

(٢٣٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ * (رواه ابن ماجة)

২৩৯। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম-সন্তান! তুমি যদি প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সন্তুষ্টি ও পুণ্যের প্রত্যাশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জীবনে যখন কোন আঘাত ও ব্যথা আসে, তখন এর প্রতিক্রিয়া শুরুতেই বেশী হয়ে থাকে। অন্যথায় কিছু দিন পার হয়ে গেলে তো এর প্রভাব আপনা আপনিই দূর হয়ে যায়। এ জন্য প্রকৃত ধৈর্য সেটাই, যা আঘাতের চোট লাগার সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় করা হয়ে থাকে। এ ধৈর্যেরই মর্যাদা রয়েছে এবং এরই উপর সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পরবর্তীতে স্বাভাবিকভাবে যে ধৈর্য ও সবর এসে যায়, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, যে ঈমানদার বান্দা কোন আঘাত পাওয়ার সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাত দান করবেন এবং জান্নাত ছাড়া অথবা এর চেয়ে কম মর্যাদার কোন জিনিস এ ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহু আকবার! কত বড় অনুগ্রহের কথা! আল্লাহ্ স্বয়ং বান্দাকে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে আদম-সন্তান! যখন আমার তকদীরের ফায়সালায় তোমার জীবনে কোন দুঃখ ও আঘাত আসে, তখন যদি তুমি আমার সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায় ধৈর্যের সাথে এটা বরণ করে নাও, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত না দিয়ে খুশী হব না। এ ধৈর্যের কারণে বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র এমন বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, তাকে জান্নাত না দিয়ে তিনি নিজেই খুশী হবেন না।

ফায়দা ঃ আল্লাহ্‌র কোন বান্দার উপর যখন কোন দুঃখ-যন্ত্রণা এসে যায়, তখন সে যদি এ হাদীসটি এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতির কথাটি স্মরণ করে ধৈর্য অবলম্বন করে,

তাহলে এ ধৈর্যের মধ্যে সে ইন্‌শাআল্লাহ একটা বিশেষ স্বাদ ও মজা পেয়ে যাবে। আর আখেরাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাত তো তাকে দেওয়াই হবে।

(٢٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِيْ مَالِهِ اَوْ فِيْ نَفْسِهِ فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ * (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২৪০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেল অথবা তার নিজের উপর কোন মুসীবত এসে গেল, আর সে তা গোপন রাখল এবং মানুষের নিকট এর কোন অভিযোগ করল না, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ সবর ও ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে এই যে, মানুষ তার বিপদ ও কষ্টের কথা কারো কাছে প্রকাশও করবে না। এ ধরনের ধৈর্যশীলদের জন্য এ হাদীসে ক্ষমার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাদেরকে ক্ষমা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন।

(٢٤١) عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتْ اِبْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَءُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَّرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪১। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (হযরত যয়নব [রাঃ]) তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার একটি ছেলে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছে এবং তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আপনি এক্ষুণি তশরীফ আনুন। তিনি এর উত্তরে সালাম ও এ বাণী পাঠালেন, আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এটাও তাঁর এবং তিনি যা দেন সেটাও তাঁর। এক কথায় প্রতিটি জিনিস সর্বাবস্থায় তাঁরই। (তাই তিনি যদি কাউকে কিছু দেন, তাহলে নিজের জিনিসই দেন, আর কারো নিকট থেকে যদি কিছু নিয়ে নেন, তাহলে নিজের জিনিসই ফেরত নেন।) আর প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে মেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে। (ঐ সময় এসে গেলে দুনিয়া থেকে ঐ বস্তু উঠিয়ে নেওয়া হয়।) অতএব, তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখ। নবী-কন্যা আবার বার্তা পাঠালেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, এখন আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। এবার তিনি

উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে সাহাবীদের মধ্য থেকে সা'দ ইবনে ওবাদা, মো'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে ছাবেত প্রমুখও রওয়ানা হলেন। (সেখানে যাওয়ার পর) শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে দেওয়া হল, তখন সে খুব কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এ দেখে হযরত সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী! তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা হচ্ছে মায়া-মমতার প্রভাব, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর ঐসব বান্দাকেই দয়া করবেন, যাদের মধ্যে দয়া-মায়ার অনুভূতি রয়েছে। (আর যাদের অন্তর পাষাণ এবং দয়ার অনুভূতিশূন্য, তারা আল্লাহ্র দয়া ও রহমতের অধিকারী হতে পারবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন আঘাতে অন্তর আহত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। ধৈর্যের দাবী কেবল এতটুকু যে, বান্দা বিপদ এবং আঘাতকে আল্লাহ্র ইচ্ছা বিশ্বাস করে বান্দাসুলভ মানসিকতা নিয়ে একে বরণ করে নেবে, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ এবং তাঁর প্রতি অভিযোগকারী হবে না; বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে থাকবে। তারপর প্রকৃতিগতভাবে অন্তর আহত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এটা তো অন্তরের কোমলতা এবং দয়ানুভূতির অনিবার্য ফল, যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন। আর এটা আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত। যে অন্তর এ নেয়ামত থেকে শূন্য, সে অন্তর আল্লাহ্র রহমত ও কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখে যে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেছিলেন, এর কারণ এই ছিল যে, তিনি তখনও জানতেন না যে, অন্তর প্রভাবিত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী নয়।

(٢٤٢) عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّعْزِيَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهٖ فِيْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطُ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيِّتًا وَّ لَا يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ وَالسَّلَامُ * (رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط)

২৪২। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর এক পুত্র-সন্তান মারা গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এ সমবেদনাপত্র লিখলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে মো'আয ইবনে জাবালের নামে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তারপর এ কামনা করছি যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে বিরাট বিনিময় দান করেন, ধৈর্য ধারণের তওফীক দেন এবং আমাদেরকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায় করার তওফীকও দান করেন। আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন আল্লাহ্‌র সুখকর দান এবং তাঁর প্রদত্ত ক্ষণস্থায়ী আমানত বিশেষ। (তোমার পুত্রও একটি আমানত ছিল।) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তার দ্বারা খুশী এবং ঈর্ষণীয় সুখ দান করেছেন এবং এখন বিরাট পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তুমি যদি পুণ্যের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য থাকবে বিরাট পুরস্কার, অশেষ অনুগ্রহ এবং হেদায়াত। অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। তোমার অস্থিরতা ও হা-হুতাশ যেন তোমার প্রতিদানকে বিনষ্ট করে না দেয়। এমন করলে তুমি শেষে অনুতপ্ত হবে। মনে রাখবে, অস্থিরতা ও হা-হুতাশ কোন মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং কোন শোককে দূর করতে পারে না। যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। ওয়াস্‌সালাম। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে বিপদে ধৈর্য ধারণকারী বান্দাদেরকে তিনটি জিনিসের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তাদের উপর থাকবে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ, তাদেরকে আল্লাহ্ রহমত দিয়ে ধন্য করবেন এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআনী সুসংবাদের দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তুমি যদি আখেরাতের প্রতিদান ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় এ বিপদে ধৈর্য অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তুমি অফুরন্ত অনুগ্রহ, রহমত এবং হেদায়াত লাভ করতে পারবে।

শিক্ষা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমবেদনাপত্রে প্রত্যেক ঐ ঈমানদার বান্দার জন্য উপদেশ ও সান্ত্বনা রয়েছে, যার জীবনে কোন বিপদ ও আঘাত আসে। হায়! আমরা যদি নিজেদের বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঈমানদীপ্ত সমবেদনা ও উপদেশ দ্বারা নিজেদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে নিতাম এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাকে নিজেদের রীতি বানিয়ে নিতাম!

(٢٤٣) عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ اُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২৪৩। উম্মুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্বামী আবুদ দারদা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)কে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মত পাঠাব, যাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, যখন তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুখ ও নেয়ামত লাভ

করবে, তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, আর যখন কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে, তখন তারা ধৈর্য সহকারে তা বরণ করে নেবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করবে। অথচ তাদের মধ্যে (বিশেষ পর্যায়ের কোন) সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মধ্যে যখন সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না, তাহলে তাদের পক্ষে সুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা কি সম্ভব হবে? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিলেন ঃ আমি আমার সহিষ্ণুতা ও আমার জ্ঞান থেকে তাদেরকে কিছু অংশ দিয়ে দেব। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ বিপদে হতাশ হয়ে যাওয়া এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়া আর আল্লাহ্‌র নেয়ামত লাভ ও সুখের সময় উন্মত্ত হয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌কেও ভুলে যাওয়া মানুষের একটি সহজাত দুর্বলতা। কুরআন মজীদে এ অবস্থাটিই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন হা-হুতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।" তাই কোন উম্মত ও জনগোষ্ঠীর চরিত্র যদি এমন হয় যে, তারা বিপদে ধৈর্যশীল এবং কল্যাণপ্রাপ্তির সময় কৃতজ্ঞ, তাহলে এটা হবে তাদের উপর আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের বিরাট বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা এবং পরবর্তী যুগের পুণ্যবান মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আধ্যাত্মিক ও গুণাবলী দান করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি গুণ এও যে, তাদেরকে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর তাদের এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মূল উৎস তাদের বিস্তর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আপন প্রজ্ঞা ও স্থৈর্যের সামান্য ছিটেফোঁটা দান করে দিয়েছেন। এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এরই ফল।

আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে এ উম্মতের অন্য আরো বহু বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ববর্তী নবীদের কাছে উল্লেখ করেছেন, তেমনিভাবে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ উম্মতের যে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব থাকবে, সেটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। ঈসা (আঃ) যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনের যে কাজ তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ আনজাম দিয়েছেন, এর পরিপূর্ণতা তাঁর পরে আগমনকারী আল্লাহ্‌র শেষ নবীর দ্বারা হবে। এর ফলে এমন এক উম্মতের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার চরম স্তরে উন্নীত এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞান ও সহনশীলতার গুণে সমৃদ্ধ হবে।

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা ও ভাগ্যলিপিতে সন্তুষ্টি

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য আমরা জানতে পেরেছি, এগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বাস্তবতা এও যে, এ অস্তিত্ব জগতে যা কিছু হয় এবং যে যা পায় ও পায় না, এ সব কিছুই সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তাঁর সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভূমিকা কেবল এতটুকুই যে, এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে ঐসব জিনিস পৌঁছার আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত শুধু মাধ্যম ও পথ। যেমন, বাসা-বাড়ীতে যে পাইপ দিয়ে পানি আসে, এটা কেবল পানি সরবরাহের রাস্তা, পানি সরবরাহে এর নিজের কোন দখল ও ভূমিকা নেই। অনুরূপভাবে এ অস্তিত্ব জগতে কার্য পরিচালনা উপায়-উপকরণের হাতে নয়; বরং কর্ম পরিচালক ও ফলোৎপাদক কেবল মহান আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর নির্দেশ।

এ বাস্তবতার উপর অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের সকল উদ্দেশ্য ও সকল কাজে কেবল আল্লাহ্‌র মহান সত্তার উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা, তাঁরই প্রতি ধ্যান রাখা, তাঁরই

অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখা, তাঁরই কাছে আশা পোষণ করা, তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁরই কাছে দো'আ করা—এ কর্মপদ্ধতিরই নাম দ্বীনের পরিভাষায় "তাওয়াক্কুল" ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা।

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত স্বরূপ এটিই। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ বর্জন করে দেওয়া তাওয়াক্কুলের জন্য জরুরী নয়। সকল নবী-রাসূলের বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তাঁর সাহাবীদের এবং প্রত্যেক যুগের খোদাপ্রেমিক ওলীদের তাওয়াক্কুল এটাই ছিল। এসব পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ অস্তিত্ব জগতের উপায়-উপকরণের ধারাকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও নির্দেশের অধীনে এবং তাঁরই হেকমতের দাবী মনে করে সাধারণ অবস্থায় এগুলো ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন, কিন্তু অন্তরের আস্থা এবং ভরসা কেবল আল্লাহ্‌র হুকুমের উপরই থাকত। তাঁরা উপায়-উপকরণকে পানির পাইপ লাইনের মত কেবল একটি মাধ্যম ও রাস্তাই মনে করতেন। এ জন্য তাঁরা এসব আসবাব-উপকরণ ব্যবহারের সময়ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর বিধানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। তাছাড়া এ বিশ্বাসও রাখতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও শক্তি এ আসবাব-উপকরণের অধীন নয়; বরং তিনি ইচ্ছা করলে এগুলো ছাড়াই সবকিছু করতে পারেন। আর তাঁরা কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যক্ষও করতেন এবং এর অভিজ্ঞতাও লাভ করতেন।

সারকথা, উপায় উপকরণ বর্জন করা তাওয়াক্কুলের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর জন্য শর্তও নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কোন বিশ্বাসী বান্দা যদি অন্তরের অবস্থার কাছে পরাভূত হয়ে উপায়-উপকরণ বর্জন করে দেয়, তাহলে এটা আপত্তিকর বিষয়ও নয়; বরং তাদের বেলায় এটা গুণ ও পরাকাষ্ঠাই হবে। অনুরূপভাবে আসবাব উপকরণ থেকে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এবং এগুলোর স্থলে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করার জন্য অথবা অন্যদেরকে এটা প্রত্যক্ষ করানোর জন্য কেউ যদি আসবাব-উপকরণ বর্জনের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে এটাও সম্পূর্ণ সঠিক হবে। কিন্তু তাওয়াক্কুলের প্রকৃত স্বরূপ কেবল তাই, যা উপরে বলা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীসে এরই প্রতি উৎসাহ প্রদান ও এরই প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, আর এরই ধারকদের প্রশংসা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ তাওয়াক্কুল ঈমান ও তওহীদের পূর্ণতার অনিবার্য ফল। যার তাওয়াক্কুল নসীব হয়নি, নিঃসন্দেহে তার ঈমান ও তওহীদ পরিপূর্ণ নয়।

তারপর তওয়াক্কুলেরও উপরের স্তর হচ্ছে "রেজা বিল কাযা" বা ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্টি। এর মর্ম এই যে, বান্দার উপর ভাল অথবা মন্দ যে কোন অবস্থাই আসুক, সে একথা বিশ্বাস করে তা অন্তর দিয়ে মেনে নেবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকবে যে, আমার মালিকই আমাকে এ অবস্থায় রেখেছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলোর মত কষ্ট ও বিপদের মুহূর্তেও তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এই হওয়া চাই ঃ "বন্ধুর পক্ষ থেকে যাই আসে সেটাই ভাল।"

এ ভূমিকামূলক কয়েকটি লাইনের পর এবার তাওয়াক্কুল ও ভাগ্যলিখনে সন্তুষ্টি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

(٢٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দা, যারা মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে না, অশুভ লক্ষণ বলে কিছু বিশ্বাস করে না এবং তারা কেবল নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের সঠিক মর্ম বুঝার জন্য প্রথমে একথা জেনে নেওয়া চাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন, সে যুগে আরবের অধিবাসীদের মধ্যে অন্যান্য ছোট বড় সংশোধনযোগ্য মন্দ বিষয়সমূহ ছাড়া এ দু'টি মন্দ বিষয়ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ঃ (১) যখন তারা নিজেরা অথবা তাদের সন্তানরা কোন রোগে আক্রান্ত অথবা দুঃখ-কষ্টে পতিত হত, তখন তারা ঐ যুগের মন্ত্র-সাধকদের দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্র করাত এবং বিশ্বাস করত যে, এ মন্ত্র-তন্ত্র বিপদ ও দুঃখ তাড়াবার এক সহজ কৌশল। (আর এসব মন্ত্র-তন্ত্র সধারণতঃ জাহেলিয়্যত যুগেরই ছিল।) (২) তারা যখন এমন কোন কাজ করার ইচ্ছা করত, যাতে লাভ-লোকসান এবং হার-জিত উভয়টির সম্ভাবনা থাকত, তখন তারা শুভাশুভের ফাল বের করত। ফাল যদি অশুভ বের হয়ে আসত, তাহলে মনে করত যে, এ কাজ আমাদের জন্য ভাল হবে না। এ জন্য তারা আর এ কাজে অগ্রসর হত না। মোটকথা, এ ফাল বের করাকেও তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সহজ পদ্ধতি মনে করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থলে এতদুভয় বিষয়ের নিন্দাবাদ করেছেন এবং এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, রোগ দূর করার জন্য যেন মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করা হয় এবং অশুভ লক্ষণ ও এর প্রভাব গ্রহণের এ পদ্ধতিও যেন বর্জন করা হয়। মানুষ যেন এ বিশ্বাস রাখে যে, রোগ ও সুস্থতা এবং লাভ ও ক্ষতি সবকিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তাই তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং নিজের উদ্দেশ্যাবলী ও প্রয়োজন পূরণের জন্য শুধু ঐসব উপায় ও তদবীর কাজে লাগাতে হবে, যা আল্লাহ্‌র মর্জির পরিপন্থী না হয়। কেননা, প্রকৃত কার্যকারক ও ফলোৎপাদক এ আসবাব-উপকরণ নয়; বরং মহান আল্লাহ্‌র সত্তা ও তাঁর হুকুমই সবকিছুর নিয়ামক। অতএব, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা যা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়— এটা খুবই নির্বুদ্ধিতার কথা। তাই এ হাদীসের মর্ম এটাই যে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দারা হবে তারাই, যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে মন্ত্র-তন্ত্র ও শুভ-অশুভ ফাল গ্রহণের এ ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলো পরিত্যাগ করেছে।

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা এ অর্থ বুঝেছে যে, এসব লোক সব ধরনের আসবাব-উপকরণের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলকারী হবে; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, যদি এটাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবেই তা উল্লেখ করতেন। এ ক্ষেত্রে আসবাব-উপকরণের মধ্য থেকে কেবল এ দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হাদীসের মর্ম এটাই যে, এসব বান্দা হবে তারাই, যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন ও প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করার কারণে এবং তাঁরই ইচ্ছা ও হুকুমকে আসল নিয়ামক বিশ্বাস করার কারণে ঐসব উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে না, যা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়। অতএব, এ হাদীসটি নিজেই একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আসবাব-উপকরণ যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য নিজের হেকমত দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং শরীঅত যেগুলোর অনুমতি দিয়েছে, এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের দাবী

নয়; বরং কেবল ঐসব উপায়-উপকরণ বর্জন করাই তাওয়াক্কুলের দাবী, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয় এবং শরীঅত যেগুলোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। তবে তাওয়াক্কুলের জন্য এটা অবশ্যই জরুরী যে, মানুষ আসবাব-উপকরণকে কেবল একটা রাস্তা মনে করবে এবং আল্লাহ্‌র হেকমতের পর্দা বলে বিশ্বাস করবে। আর অন্তরের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই থাকবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংখ্যা শুধু তাদের, যারা এ মর্যাদার প্রথম স্তরে থাকবে। অন্যথায় অপর এক হাদীসে এ অতিরিক্ত বর্ণনাও এসেছে যে, তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো সত্তর হাজার করে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তাছাড়া একথা পূর্বেও কয়েক দফা বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষা ও এর বাকরীতিতে সত্তর সংখ্যাটি শুধু আধিক্য ও প্রাচুর্য বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও সম্ভবতঃ এটাই উদ্দেশ্য।

এ হাদীসটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও আখেরাতে সংঘটিতব্য একটি ঘটনার সংবাদই শুধু নয়; বরং হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব উম্মতের কাছে এ হাদীস পৌঁছবে, তারা যেন নিজেদের জীবনকে তাওয়াক্কুলের জীবন বানিয়ে নেয়। যাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দাদের তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(٢٤٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا * (رواه الترمذى وابن ماجة)

২৪৫। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর এমন ভরসা কর, যেমন ভরসা করা উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এভাবে রিযিক দান করবেন, যেভাবে পক্ষীকুলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। এরা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, আদম-সন্তানরা যদি জীবিকার বেলায় আল্লাহ্‌র উপর এমন ভরসা করে, যেরূপ ভরসা তাদের করা উচিত, তাহলে তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ এই হবে যে, তিনি পাখীদেরকে যেমন সহজে রিযিক দিয়ে থাকেন যে, তারা মানুষের মত কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই সামান্য নড়াচড়ার দ্বারা রিযিক পেয়ে যায়। সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকেও সহজ-ভাবে রিযিক সরবরাহ করবেন। তাদের এত বেশী চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হবে না, যেমন এখন করতে হয়।

(٢٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِقَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اتَّبَعَ قَلْبُهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ * (رواه ابن ماجة)

২৪৬। হযরত 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের অন্তরের জন্য প্রতিটি ময়দান ও উপত্যকায় একেকটি শাখা রয়েছে। (অর্থাৎ, প্রতিটি ময়দানে মানুষের অন্তরের খাহেশ বিস্তৃত ও ছড়িয়ে আছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে এসব শাখা ও খাহেশের মধ্যে লাগিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর যে কোন শাখায় ধ্বংস করে দিতে কোন পরোয়া করবেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে (এবং নিজের সকল প্রয়োজন তাঁর হাওয়ালা করে দেবে, আর নিজের জীবনকে আল্লাহ্র হুকুমের অধীন বানিয়ে নেবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের তরজমার সাথেই এর মর্ম স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসের আসল অর্জন ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, বান্দা যেন নিজের সকল প্রয়োজনকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করে দেয়, তাঁর উপর ভরসা ও আস্থা রাখে, তাঁর বিধানের অনুসারী হয়ে জীবন কাটায় এবং দুনিয়ার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের চেষ্টা-সাধনাকেও তাঁর বিধানের অধীন করে দেয়। এরূপ করলে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং তিনিই তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

(٢٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ * (رواه احمد والترمذى)

২৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে পেছনে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র খেয়াল রাখ, (অর্থাৎ, তাঁর হুকুম পালন এবং তাঁর হক আদায় থেকে গাফেল হয়ো না।) আল্লাহ্ তোমার খেয়াল রাখবেন, (এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ-মুসীবত থেকে তোমাকে হেফাযত করবেন।) তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখ, তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার ইচ্ছা কর, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাও, যখন তুমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হও, তখন আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর একথা অন্তরে বদ্ধমূল করে নাও যে, দুনিয়ার তাবৎ জনগোষ্ঠী যদি

একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে তারা কেবল তোমার এতটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবে মিলে কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা কেবল এতটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। (এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না।) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিও শুকিয়ে গিয়েছে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম ও উদ্দেশ্য এবং এর প্রাণবস্তু এটাই যে, সব ধরনের লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। এর বাইরে কারো এখতিয়ারে কোন কিছুই নেই। এমনকি যদি সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কোন বান্দার কোন উপকার অথবা ক্ষতি করতে চায় কিংবা সুখ দিতে বা কষ্টে ফেলে দিতে চায়, তবুও আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর ফায়সালার বিপরীত কিছুই করতে পারবে না। অস্তিত্বে কেবল সেটাই আসবে এবং সেটাই হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং ভাগ্য লিখনের কলম যা এখন থেকে অনেক আগেই লেখার কাজ সেরে নিয়েছে এবং এ লেখা শুকিয়েও গিয়েছে। এমতাবস্থায় নিজের প্রয়োজনের জন্য কোন মাখলূকের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করা অথবা তার কাছে সাহায্য চাওয়া কেবল মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাই হবে। তাই যা চাইতে হয়, আল্লাহ্র কাছে চাও এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁরই কাছে হাত বাড়াও। আর তাঁর নিকট থেকে পাওয়ার পথ এই যে, তাঁকে এবং তাঁর বিধানাবলী ও তাঁর অধিকারসমূহকে স্মরণে রাখ। তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন, তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করবেন।

যেহেতু কিতাবুল ঈমানে তকদীরের আলোচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বলে আসা হয়েছে যে, তকদীরের মর্ম কি এবং তকদীর মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আমল ও তদবীরের প্রয়োজন হয় কেন, এ জন্য এ সংশয় ও খটকা সম্পর্কে এখানে লেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। পাঠকদের মধ্যে কারো যদি এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে, তাহলে তিনি মা'আরিফুল হাদীস, প্রথম খণ্ডে তকদীরের আলোচনাটি পুনরায় দেখে নিতে পারেন।

(٢٤٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ اِنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدْسِ) نَفَثَ فِيْ رَوْعِيْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِي اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهِ * (رواه البغوى فى شرح السنة والبيهقى فى شعب الايمان)

২৪৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! যে বস্তু তোমাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখতে পারে, এমন সব বিষয়ের নির্দেশই আমি তোমাদেরকে

দিয়েছি। তদ্রূপভাবে যে বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, এমন সব বিষয় থেকেই আমি তোমাদেরকে বারণ করে রেখেছি। (অর্থাৎ, কোন নেকী ও পুণ্যের বিষয় এমন অবশিষ্ট নেই, যার শিক্ষা আমি তোমাদেরকে দেইনি, আর কোন মন্দ ও গুনাহের বিষয় এমন বাকী নেই, যেগুলো থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি।) হযরত রুহুল আমীন— অন্য এক বর্ণনায় রুহুল কুদুস (উদ্দেশ্য হযরত জিবরাঈল [আঃ]) এইমাত্র আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ ওহী পৌঁছে দিয়েছেন) যে, কোন প্রাণী সেই পর্যন্ত মারা যায় না, যে পর্যন্ত না সে নিজের রিযিক পূর্ণ করে নেয়। (অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার মৃত্যুর পূর্বে তার নির্ধারিত রিযিক অবশ্যই ভাগ্যে জুটে যায়। যে পর্যন্ত তার রিযিক পূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু আসতেই পারে না।) তাই হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং রিযিক অন্বেষণে পুণ্য ও পরহেযগারীর পন্থা অবলম্বন কর। আর কাঙ্ক্ষিত রিযিকের কিছুটা বিলম্ব তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্‌র নাফরমানীর পথে তা অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। —শরহুস্‌সুন্নাহ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশটি কেবল একটি ভূমিকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আসলে ঐ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন, যা জিবরাঈল (আঃ) ঐ মুহূর্তে তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু উপস্থিত লোকদের মনকে পূর্ণরূপে মনোযোগী করার জন্য প্রথমে তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! হারাম-হালাল এবং পাপ-পুণ্যের সকল বিষয়ের শিক্ষাই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একটি চূড়ান্ত কথা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, যা এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গিয়েছেন।

এ ভূমিকা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মস্তিষ্ককে জাগ্রত এবং তাদের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। তারপর ঐ বিশেষ কথাটি বললেন, যার সারবস্তু এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির রিযিক লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। এ রিযিক তার মৃত্যুর পূর্বে সে পেয়েই যাবে। ব্যাপার যখন তাই, তাহলে মানুষের উচিত, রিযিক ও জীবিকা লাভে যদি কিছুটা বিলম্বও ঘটে, তবুও সে যেন এটা অর্জন করার জন্য এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জির খেলাফ এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিকের মালিক— এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে কেবল হালাল ও বৈধ পন্থায়ই এটা উপার্জনের চেষ্টা করবে। কেননা, আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর পথেই লাভ করা যায়।

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। মনে করুন, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা অভাবে পড়ে আছে, তার পেট ভরার জন্য কিছু পয়সার প্রয়োজন। এ সময় সে এক ব্যক্তিকে দেখল যে, সে ঘুমাচ্ছে। শয়তান তখন এসে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, এ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন জিনিস তুলে নাও এবং এখনই তা হাতে হাতে বিক্রি করে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে নাও। এ সময়ের জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষা যে, তুমি বিশ্বাস রাখ যে, যে জীবিকা তোমার জন্য নির্ধারিত সেটা তোমার হাতে আসবেই। তাই তুমি কেন চুরি করে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট, নিজের বিবেক ও আত্মাকে কলুষিত

এবং নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবে ? তুমি তোমার নির্ধারিত চুরির মাধ্যমে না, কোন হালাল ও বৈধ উপায়ে অর্জনের চেষ্টা কর। হালালের ময়দান ও ক্ষেত্র তো কখনো সংকীর্ণ নয়।

(٢٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى اَهْلِهٖ فَلَمَّا رَأَى مَابِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ اِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهٗ قَامَتْ اِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتْهَا وَاِلَى التَّنُّوْرِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَاِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَأَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ اِلَى التَّنُّوْرِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا قَالَتِ امْرَأَتُهٗ نَعَمْ مِنْ رَبِّنَا وَقَامَ اِلَى الرَّحٰى فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُوْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ * (رواه احمد)

২৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে আসল। সে যখন তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখল, তখন (কাতরতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করার জন্য) ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। যখন তার স্ত্রী দেখল (যে, স্বামী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাওয়ার জন্য বের হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল এবং) সে উঠে চাক্কির কাছে গেল এবং সেটা স্থাপন করল, (যাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন শস্য আসলে তা দ্রুত পিষে নেওয়া যায়।) তারপর সে চুলার কাছে গেল এবং আগুন ধরিয়ে দিল। (যাতে আটা পিষে নেওয়ার পর রুটি তৈরীতে দেরী না হয়।) তারপর সে নিজেও এভাবে দো'আ করতে লাগল ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিযিক দান কর। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে দেখল যে, চাক্কির নীচের বিরাট পাত্রটি আটায় ভর্তি হয়ে আছে। তারপর সে চুলার কাছে গিয়ে দেখল যে, চুলাও রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তারপর স্বামী ফিরে আসল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি কি কিছু পেয়েছ ? স্ত্রী উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছি। (অর্থাৎ, সরাসরি গায়েবী ভাণ্ডার থেকে এভাবে পেয়েছি।) একথা শুনে সেও চাক্কির কাছে গেল (এবং বিস্ময় ও কৌতূহল বশতঃ এর একটি পাট খুলে দেখল।) তারপর যখন এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হল, তখন তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, সে যদি এটা উঠিয়ে না দেখত, তাহলে এ চাক্কি কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ঘুরতে থাকত এবং এখান থেকে আটা বের হতে থাকত। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটা অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দানসমূহ সাধারণতঃ উপায়-উপকরণের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের খেলা এভাবেও প্রকাশিত হয় যে, উপকরণ জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীত সরাসরি আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন ঘটনা ঘটে যায়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য— যিনি এ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা— এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এ ধরনের কোন ঘটনা যদি আল্লাহ্ তা'আলার কোন নবীর হাতে

প্রকাশ পায়, তাহলে এটাকে মু'জেযা বলা হয়, আর যদি নবীর অনুসারী কোন উম্মতের হাতে এ ধরনের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে একে কারামত বলা হয়।

এ ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে তাঁর কাছে রিযিক চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ এভাবে কবূল করলেন যে, অলৌকিক পন্থায় তাদের জন্য রিযিকের উপকরণ পাঠিয়ে দিলেন। গায়েব থেকে চাক্কিতে আটা এসে গেল এবং চুলায় রুটি তৈরী হয়ে গেল।

যেসব লোক তাওয়াক্কুলের সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের মনে হয়তো এ ধরনের ঘটনার বেলায় সংশয় ও খটকা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিচয় কিছুটা হলেও লাভ করেছে, তাদের জন্য এসব ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর যথার্থ ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। (সূরা ত্বালাক্ব)

(٢٥٠) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ * (رواه احمد والترمذى)

২৫০। হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের একটি সৌভাগ্যের দিক হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর তার সন্তুষ্ট থাকা। আর আদম-সন্তানের দুর্ভাগ্যের একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে তার কল্যাণ কামনা না করা। তার আরেকটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ তার জন্য যা ফায়সালা করে রেখেছেন, এতে অসন্তুষ্ট থাকা। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও ভাগ্য লিখনের কারণে মানুষের উপর অনেক সময় এমন অবস্থা আসে, যা তার মনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বান্দার সৌভাগ্য ও কল্যাণের লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও বান্দাদের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল বিশ্বাস করে তাঁর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর খুশী থাকবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে মন্দ মনে করবে, অথচ বাস্তবে ও পরিণামে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তেমনিভাবে তোমরা হয়তো একটি জিনিসকে পছন্দ করবে, অথচ বাস্তব ও পরিণামের বিচারে এতে অকল্যাণ ও ক্ষতি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন আর তোমরা জান না।

দ্বিতীয় কথাটি এ হাদীসে এই বলা হয়েছে, বান্দার জন্য জরুরী যে, সে সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে এ দো'আ করতে থাকবে, আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জন্য যে কল্যাণ রয়েছে, তার জন্য যেন এরই ফায়সালা করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলে দিয়েছেন যে, বান্দার নিজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা না করা তার জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। অনুরূপভাবে এটাও বান্দার দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহ্‌র ভাগ্যলিপি ও তাঁর ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে।

একথা স্পষ্ট যে, ভাগ্য লিখনে সন্তুষ্টির এ স্তর বান্দা তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে পারে, কুরআন মজীদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণাবলীর কথা মানুষকে বলে দিয়েছেন। তারপর এ মা'রেফাত ও ঈমান-ইয়াকীনের ফলে তার অন্তর আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসায় সিক্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঈমান ও ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়ার পর বান্দার অন্তরের উচ্চারণ এই হয়ে থাকে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, তাহলে এটা হবে তোমার অনুগ্রহ, আর যদি আমাকে মেরে ফেল, তাহলে এতেও আমার আপত্তি করার কিছু নেই। আমার অন্তর তোমার পাগল, তাই তুমি যাই কর, তাতেই আমি খুশী।

এখলাছ ও একনিষ্ঠতা এবং নাম-যশ কামনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ মানবজগত উত্তম চরিত্র ও গুণাবলীর যে শিক্ষা পেয়েছে, এ অধমের দৃষ্টিতে এর পূর্ণতা, এখলাছ ও একনিষ্ঠতার শিক্ষা দ্বারা সাধিত হয়। অর্থাৎ, এখলাছ ও একনিষ্ঠতা হচ্ছে নৈতিকতা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তকারী শেষ পাঠ ও আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির শেষ সোপান।

এ এখলাছ ও একনিষ্ঠতার মর্ম এই যে, প্রত্যেক সৎকর্ম অথবা কারো সাথে উত্তম আচরণ কেবল এ জন্য এবং এ নিয়্যতে করা যে, এতে আমার পরওয়ারদেগার খুশী হবেন, আমার উপর দয়া করবেন এবং আমি তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, এখলাছই প্রত্যেক সৎকর্মের আত্মা ও প্রাণ। যদি কোন অতি উত্তম কাজও এখলাছশূন্য হয় এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন না হয়; বরং যশ, সুখ্যাতি অথবা এ ধরনের কোন মনোবৃত্তি এর পেছনে কার্যকর থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর কোনই মূল্য নেই এবং এর উপর কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

কথাটি অন্য শব্দমালায় এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের প্রতিদান— যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রের আসল পুরস্কার ও ফল এবং যা মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কামনা হওয়া চাই— সেটা কেবল কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতেই লাভ করা যায় না; বরং সেটা কেবল তখন লাভ করা যায়, যখন ঐ কর্ম ও চরিত্র দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের প্রতিদান লাভের ইচ্ছা এবং নিয়্যতও করা হয়, আর এটাই যখন এ কাজে উদ্বুদ্ধকারী হয়। আর আসলেও এমনটাই হওয়া চাই। কেননা, আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও এটাই আমাদের নীতি।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনার খুব সেবা ও খেদমত করে, আপনাকে সর্বদিক দিয়ে শান্তি দিতে এবং খুশী রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন সূত্রে আপনি যদি জানতে পারেন যে, আপনার প্রতি তার কোন আন্তরিকতা নেই; বরং তার এ আচরণ ও ব্যবহার তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা সে আপনার কোন বন্ধু অথবা ঘনিষ্ঠজন থেকে নিজের কোন কাজ আদায় করে নিতে চায় এবং কেবল এ উদ্দেশ্যেই আপনাকে দেখানোর জন্য শুধু এ আচরণ করে, তাহলে আপনার অন্তরে তার এবং তার এ আচরণের কোন মূল্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারটাও ঠিক তদ্রূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা অন্যদের অন্তরের অবস্থা জানি না, আর আল্লাহ্ তা'আলা সকলের অন্তরের অবস্থা এবং তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য জানেন। অতএব, তাঁর যেসব বান্দার অবস্থা এই যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায়

পুণ্যকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের আমল কবূল করে তাদের প্রতি খুশী হন এবং তাদের উপর রহমত নাযিল করেন। আর আখেরাত— যা প্রকৃত প্রতিদান জগত— সেখানেই তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ার মানুষের বাহবা কুড়ানোর জন্য অথবা নাম-যশ ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য সৎকর্মের মহড়া দেখায়, তাদের এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতে যদি সফলও হয়ে যায়, তবুও তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত থেকে বঞ্চিতই থাকবে। তাদের এ বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটির পূর্ণ প্রকাশও আখেরাতেই ঘটবে।

এ অধ্যায়ের মূল ভিত্তি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ ঐ হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে ঃ সকল কাজের মূল্যায়ন নিয়্যতের ভিত্তিতেই করা হয়। হাদীসটি প্রথম খণ্ডের একেবারে শুরুতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেখানেই এর ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তাই এখানে এর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। এখানে ঐ হাদীসটি ব্যতীত এ সংক্রান্ত অন্য কয়েকটি হাদীস আনা হচ্ছে এবং এ হাদীসগুলোর মাধ্যমেই দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(٢٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ * (رواه مسلم)

২৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দেহাকৃতি ও তোমাদের সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম এবং আমল দেখেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি কারো আকৃতি-অবয়ব অথবা তার সম্পদশালী হওয়া নয়; বরং অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আমলের উৎকর্ষই হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি। তিনি কোন বান্দার জন্য সন্তুষ্টি ও রহমতের ফায়সালা তার চেহারা-আকৃতি অথবা তার ধন-সম্পদের ভিত্তিতে করেন না; বরং তার অন্তরের গতি ও কর্মের উৎকর্ষের ভিত্তিতে করে থাকেন।

এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় উল্লিখিত শব্দমালার স্থলে এ শব্দমালা এসেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দেহ ও আকৃতি এবং তোমাদের শুধু বাহ্যিক কর্ম ও আমল দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর দেখেন। —জমউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড

এ বর্ণনার শব্দগুলো এ মর্ম আদায়ের জন্য আরো অধিক স্পষ্ট যে, গ্রহণযোগ্যতার আসল ভিত্তি অন্তরের সঠিক গতি অর্থাৎ, নিয়্যতের বিশুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, কোন ব্যক্তির আমল ও কর্ম যদি উত্তম থেকে উত্তমও হয়, কিন্তু তার অন্তর যদি এখলাছ বা নিষ্ঠাশূন্য থাকে এবং নিয়্যত শুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই আমল ও কাজ কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখলাছের বরকত এবং এর প্রভাব ও শক্তি

(٢٥٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا اِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وُلْدِيْ وَاَنَّهُ قَدْ نَاىٰ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبُهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ لَهُمْ حَتّٰى يَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ كُنْتُ اسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَ رَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَظْلِمْنِيْ وَاَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلَى الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَهْزَأْ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَااَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ * (رواه البخارى ومسلم)

২৫২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল, এমন সময় তাদেরকে বৃষ্টি ধরল। ফলে তারা একটি পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিল। সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করার পর পাহাড় হতে বিশাল এক প্রস্তরখণ্ড খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, তোমরা নিজেদের ঐসব আমলের দিকে লক্ষ্য কর, যেগুলো তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই করেছ এবং এগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কর। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন।

তাদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, আর আমার কয়েকটি ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য মাঠে ছাগল চরাতাম। সন্ধ্যা হলে আমি বাড়ী ফিরে আসতাম এবং দুধ দোহন করে প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম এবং তারপর সন্তানদের দিতাম। একদিন এমন ঘটনা ঘটল যে, চারণভূমির বৃক্ষ

আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। (অর্থাৎ, ছাগল চরাতে চরাতে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম।) তাই সময়মত বাড়ী ফিরতে পারলাম না; বরং সেখানেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। যখন বাড়ীতে ফিরে আসলাম, তখন দেখি, আমার পিতা-মাতা দু'জনই ঘুমিয়ে গেছেন। আমি অন্য দিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাদেরকে জাগিয়ে তোলাও আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছিল না, আর তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করতে দেওয়াও আমি পছন্দ করছিলাম না। এদিকে সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে পড়ে ক্ষুধায় ক্রন্দন করে যাচ্ছিল। ভোর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কেটে গেল। (আমি দুধের পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তানরা কান্নাকাটি করছে আর পিতা-মাতা বিছানায় পড়ে নিদ্রায়।) হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে, আমি এ কাজটি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি গুহার মুখ থেকে এতটুকু সরিয়ে দাও যে, আমরা আকাশ দেখতে পারি। এ দো'আর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দিলেন যে, এখন আকাশ দেখা যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল, যাকে আমি খুব ভালবাসতাম।একজন পুরুষের কোন নারীর প্রতি যত গভীর ভালবাসা হতে পারে ঠিক ততটাই ছিল আমার। আমি তার কাছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম। সে অস্বীকার করে বলল, যে পর্যন্ত আমাকে একশ স্বর্ণমুদ্রা না দিতে পারবে, এ কাজ হবে না। অতএব, আমি তা সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করলাম এবং একশ স্বর্ণমুদ্রা জমা করে ফেললাম। তারপর এগুলো নিয়ে তার কাছে আসলাম। আমি যখন (মিলনের উদ্দেশ্যে) তার দুই পায়ের মাঝখানে বসে গেলাম, তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার সতীত্ব নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আমি তখন আল্লাহ্র ভয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গেলাম (এবং তার সম্ভ্রম নষ্ট করা থেকে বিরত হয়ে গেলাম।) হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে, এ কাজটি আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি সরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য রাস্তা খুলে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! আমি এক শ্রমিককে কিছু ধানের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে যখন নিজের কাজ শেষ করল, তখন বলল, আমার মজুরী দিয়ে দিন। আমি যখন মজুরী আনতে গেলাম, এ ফাঁকে সে মজুরী না নিয়েই চলে গেল এবং নিজের হক নিতে আর ফিরে এলো না। আমি তখন তার মজুরীর ধান দিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দিলাম এবং ফসল উৎপাদন করতে থাকলাম। এভাবে এ ধানের মূল্য দিয়ে আমি অনেক গরু এবং এগুলোর রাখাল সংগ্রহ করে ফেললাম। অনেক দিন পর সেই শ্রমিক আমার কাছে আসল এবং বলল ঃ আল্লাহ্কে ভয় করুন, অবিচার থেকে বিরত থাকুন এবং আমার পাওনা পরিশোধ করে দিন। আমি উত্তর দিলাম, তুমি এসব গরু এবং রাখালদেরকে নিয়ে যাও। (কেননা, এগুলো সবই তোমার হক।) সে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্কে ভয় করুন, আমার সাথে মশকরা করবেন না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তুমি এসব গরু ও রাখালদেরকে নিয়ে যাও, এগুলো তোমারই। তারপর সে এগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ কাজটি আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি

সম্পূর্ণ সরিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তখন পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং রাস্তা খুলে দিলেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে যে তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তারা সম্ভবতঃ পূর্ব যুগের কোন নবীর উম্মত ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনায় আল্লাহ্র এসব বান্দা নিজেদের যেসকল আমলকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে দো'আ করেছিল, এগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য— যার উল্লেখ হাদীসেও রয়েছে এই যে, এ তিনটি আমলই শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় করা হয়েছিল এবং এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা এগুলো আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এ তিনটি আমলই আল্লাহ্র হুকুম ও মর্জির বিপরীত নিজের নফসের চাহিদাকে পরাভূত করা ও বিসর্জন দেওয়ার উন্নততর দৃষ্টান্ত। একটু চিন্তা করে দেখুন, প্রথম ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা ও সাধনাটি কত কঠিন! সারাদিন মাঠে পশুদেরকে ঘাস-পাতা খাওয়ানোর পর সন্ধ্যায় দেরী করে বাড়ীতে ফিরে আসল। স্বাভাবিকভাবেই তার মন ঘুমের জন্য পাগল হয়ে থাকবে। কিন্তু পিতা-মাতা যেহেতু দুধ পান না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এতেই মনে করছিল যে, যখন ঘুম ভাঙবে, তখন সে তাদেরকে দুধ পান করিয়ে দেবে। এজন্য এ ব্যক্তি সারারাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে তার সন্তানরা তার পায়ের কাছে পড়ে ক্ষুধায় কাঁদছিল। কিন্তু সে মা-বাপের হককে অগ্রগণ্য মনে করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ মুজাহাদা ও ত্যাগ স্বীকার করল যে, বুড়ো মা-বাপের আগে নিজের আদরের সন্তানদেরকেও দুধ পান করতে দিল না। এমনকি এ অবস্থায়ই প্রভাত হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলটির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ্য। একজন যুবক এক মেয়ের প্রতি প্রেম লালন করে। যখন এজন্য এক বিরাট অংকের অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় এবং অনেক কষ্ট করে এ অর্থ সংগ্রহ করে তাকে দিয়েও দেয় এবং জীবনের এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগও এসে যায় এবং কোন প্রতিবন্ধকতাও থাকে না, তখন আল্লাহ্র নাম মাঝে এসে যায় আর সে বান্দা নিজের নফ্সের চাহিদা পূরণ না করে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় উঠে চলে যায়। জৈবিক চাহিদার অধিকারী প্রতিটি মানুষ অনুমান করতে পারে যে, এটা কত কঠিন মুজাহাদা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিপরীত নফসের কামনা বিসর্জন দেওয়ার এটা কত বড় দৃষ্টান্ত।

তেমনিভাবে তৃতীয় ব্যক্তির কাজের এ বৈশিষ্ট্যটিও প্রকাশ্য যে, একজন মজুরের কয়েক সের ধান কারো কাছে রয়ে গেল। সে এ ধানগুলো নিজের ভূমিতে বপন করে দিল। তারপর যে ফসল উৎপন্ন হল সেটাকে সে ঐ মজুরের মালিকানা সাব্যস্ত করে তারই হিসাবে জমা করে এটাকে আরো বাড়াতে থাকল। এমনকি এর দ্বারা এতটুকু সম্পদ জোগাড় হয়ে গেল যে, পশুদের আস্ত একটা পাল হয়ে গেল। তারপর ঐ মজুর যখন অনেক দিন পর আসল, তখন ঐ আমানতদার পুণ্যবান ব্যক্তি ঐ সমস্ত সম্পদ— যা তার পরিশ্রমে অর্জিত হয়েছিল সেই মজুরকে দিয়ে দিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুমান করতে পারে যে, সে সময় শয়তান তার অন্তরে কি ধরনের কুমন্ত্রণা ও কুবুদ্ধি দিয়ে থাকবে। তার নফসের কত প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকবে যে,

এ সম্পদ— যা শুধু আমার পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ মজুর যার খবরও রাখে না— সেটা আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ্‌র এ বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের নফসের এ আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে দিল এবং নির্দ্বিধায় এসব সম্পদ ঐ মজুরের কাছে সমর্পণ করে দিল।

রিয়া এক ধরনের শির্‌ক ও এক প্রকার মুনাফেকী

এখলাছ ও একনিষ্ঠতা (অর্থাৎ, যে কোন নেক কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায় করা) যেমন ঈমান ও তওহীদের দাবী এবং আমলের প্রাণবস্তু, তেমনিভাবে রিয়া অর্থাৎ, লোক দেখানো এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ তথা নাম-যশের জন্য নেক কাজ করা ঈমান ও তওহীদের পরিপন্থী এবং এক ধরনের শির্‌ক।

(٢٥٣) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ * (رواه احمد)

২৫৩। হযরত শাদ্দাদ ইবনে.আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল, সে শির্‌ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শির্‌ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল, সে শির্‌ক করল। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত শির্‌ক তো এই যে, কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী অথবা তাঁর কাজ ও অধিকারের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবে। এটা হচ্ছে শির্‌কে হাকীকী, শির্‌কে জলী এবং শির্‌কে আকবার, যার ব্যাপারে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটা মুসলমানদের একটি মৌলিক বিশ্বাসও যে, এ শির্‌কে লিপ্ত ব্যক্তিকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু কিছু কর্ম ও চরিত্র এমনও রয়েছে, যেগুলো যদিও এ অর্থে শির্‌ক নয়; কিন্তু শির্‌কের কিছুটা মিশ্রণ এতে থাকে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি কাজ এও যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এবাদত অথবা অন্য কোন নেক আমল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনার স্থলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে। অর্থাৎ, এ উদ্দেশ্যে করে যে, মানুষ যেন তাকে আবেদ ও পুণ্যবান মনে করে এবং তার ভক্ত হয়ে যায়। এটাকেই রিয়া বলা হয় এবং এটা যদিও প্রকৃত শির্‌ক নয়; কিন্তু এক পর্যায়ের শির্‌ক এবং এক ধরনের মুনাফেকী ও মারাত্মক গুনাহ্। অন্য এক হাদীসে এটাকে শির্‌কে খফী অর্থাৎ, সূক্ষ্ম শিরক এবং অপর এক হাদীসে শির্‌কে আসগর তথা ছোট শির্‌ক বলা হয়েছে। (এ দু'টি হাদীসই সামনে আসবে।)

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এ হাদীসে নামায, রোযা এবং দান-খয়রাতের উল্লেখ শুধু উদাহরণ হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় এগুলো ছাড়াও যেসব নেক আমল মানুষকে দেখানোর জন্য এবং তাদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হওয়ার জন্য অথবা তাদের কাছ থেকে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হবে, সেটাও এক ধরনের শির্‌কই হবে এবং এমন আমলকারী সওয়াবের স্থলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

(٢٥٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّىْ فَيُزَيِّدُ صَلٰوتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ * (رواه ابن ماجة)

২৫৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের কক্ষ থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। এসময় আমরা দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ জিনিসের কথা বলে দেব না, যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়াবহ। আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অবশ্যই বলে দিন, সেটা কি জিনিস। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম শির্ক, (যার একটি উদাহরণ এই যে,) এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়াল, তারপর সে নিজের নামায এজন্য লম্বা করল যে, কেউ তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখছে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের মর্ম সম্ভবতঃ এই ছিল যে, দাজ্জাল যেই প্রকাশ্য শির্ক ও কুফরীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং যার উপর সে মানুষকে বাধ্য করবে, আমি এ ব্যাপারে বেশী আশংকা করি না যে, আমার কোন খাঁটি উম্মত একথা মানতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এ ব্যাপারে অবশ্যই আশংকা রয়েছে যে, শয়তান তোমাদেরকে এমন কোন শির্কে লিপ্ত করে দেবে, যা প্রকাশ্য শির্ক নয়; বরং সূক্ষ্ম ধরনের শির্ক। এর একটি উদাহরণ তিনি এই দিয়েছেন যে, নামায এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ও সুন্দর করে পড়া হবে, যাতে দর্শক এ নামাযীর ভক্ত হয়ে যায়।

ইবনে মাজাহ্ শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিজের উম্মতের শির্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করলে সাহাবায়ে কেরাম আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এমনটি মনে করেন যে, আপনার পরে আপনার উম্মত শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমি তো নিশ্চিন্ত যে, আমার উম্মত চন্দ্র, সূর্য, পাথর ও প্রতিমার পূজা করবে না, কিন্তু এটা হতে পারে যে, তারা রিয়া জাতীয় শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে।

(٢٥٥) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ * (رواه احمد)

২৫৫। হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের বেলায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশী আশংকা করি সেটা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শির্কের অর্থ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হচ্ছে রিয়া। (অর্থাৎ, কোন নেক কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য করা।) —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল বাণীর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উম্মতকে সতর্ক করা, যাতে তারা সাবধান হয়ে যায় এবং এ ধরনের সূক্ষ্ম শির্ক থেকেও নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করে। এমন যেন না হয় যে, শয়তান তাদেরকে এ সূক্ষ্ম ধরনের শির্কে লিপ্ত করে ধ্বংস করে ফেলে।

যে কাজে শির্কের সামান্য মিশ্রণও থাকবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না

(٢٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىَ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ – وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَهُ * (رواه مسلم)

২৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি শির্ক ও অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত। (অর্থাৎ, যেভাবে অন্য অংশীদাররা অংশীদারিত্বের উপর রাজী হয়ে যায় এবং নিজের সাথে অন্য কারো অংশীদারিত্ব মেনে নেয়, আমি এভাবে মেনে নিতে রাজী নই; বরং সর্বপ্রকার অংশীদারিত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত।) অতএব, যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, (অর্থাৎ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য আমার সন্তুষ্টি ও রহমত লাভ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করা অথবা তাকে ভক্ত বানানো হয়,) আমি তাকে এবং তার এ শির্ককে বর্জন করে দেই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ ঐ কাজটি আমার জন্য নয়; বরং যার জন্য করেছে তার জন্যই। —মুসলিম

(٢٥٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ فَضَالَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ نَادٰى مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ * (رواه احمد)

২৫৭। আবূ সাঈদ ইবনে আবূ ফাযালা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কোন আমল করতে গিয়ে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল, সে যেন এর প্রতিদান গায়রুল্লাহ্ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির নিকট থেকেই চেয়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শির্ক থেকে সকল অংশীদারের চেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ উভয় হাদীসের সার ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল ঐ আমলকেই গ্রহণ করেন এবং এর উপরই প্রতিদান দেন, যা এখলাছের অনুভূতি নিয়ে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ও রহমতের কামনায় করা হয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে এতে শরীক না করা হয়। এর বিপরীত যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অথবা এর দ্বারা কোন

প্রকার স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেটা কখনো কবূল করেন না। কেননা, তিনি অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এবং শির্কের সংমিশ্রণ থেকেও অসন্তুষ্ট।

এ পরিণাম তো হচ্ছে ঐসব আমলের, যেগুলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে নিয়্যতের মধ্যে পূর্ণ এখলাছ ও একনিষ্ঠতা থাকে না; বরং কোন না কোনভাবে এতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অংশ এসে যায়। কিন্তু যেসব নেক আমল কেবল রিয়ার সাথেই করা হয়, যেগুলো দ্বারা শুধু নাম-যশ, লোক দেখানো, খ্যাতিলাভ এবং মানুষের ভক্তি অর্জনই উদ্দেশ্য হয়, সেগুলো শুধু প্রত্যাখ্যান করে এসব আমলকারীর মুখেই ছুঁড়ে মারা হবে না; বরং এসব রিয়াকার মানুষ নিজেদের এসব আমলের কারণে জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হবে।

রিয়াকারদের অপমানজনক শাস্তি

(٢٥٨) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهٖ * (رواه البخارى ومسلم)

২৫৮। হযরত জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন আমল শ্রুতি ও প্রচারের জন্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারটা ভালভাবেই প্রচার করবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন আমল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আচ্ছামত দেখিয়ে দেবেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যারা লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নেক আমল করে, তাদেরকে তাদের এ কর্ম উপযোগী একটি শাস্তি এও দেওয়া হবে যে, তাদের এ রিয়াকারী ও মুনাফেকীর বিষয়টি খুব প্রচার করে দেওয়া হবে এবং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে, এ দুর্ভাগারা এসব নেক আমল আল্লাহ্র জন্য করত না; বরং নাম-যশ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করত। সারকথা, জাহান্নামের আযাবের পূর্বে তারা একটি শাস্তি এই পাবে যে, হাশরের ময়দানে সবার সামনে তাদের রিয়াকারী ও মুনাফেকীর পর্দা ছিঁড়ে দিয়ে সবাইকে তাদের অন্তরের কপটতা ও কলুষতা দেখিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জনকারী রিয়াকারদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী

(٢٥٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّاْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُنَ فَبِيْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ * (رواه الترمذى)

২৫৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করবে। তারা মানুষের উপর নিজেদের দরবেশী জাহির করার জন্য এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরিধান করবে। (অর্থাৎ, মোটা কাপড় ও কম্বল পরিধান করে নিজেকে সুফী-দরবেশ বলে প্রকাশ করবে।) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে অধিক

মিষ্টি। কিন্তু তাদের অন্তর হবে হিংস্র বাঘের অন্তরের মত। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন ঃ এরা কি আমার অবকাশ পেয়ে ধোঁকা খাচ্ছে, না আমার উপর দুঃসাহস দেখাতে চায় ? আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের উপর এমন ফেতনা চাপিয়ে দেব, যা তাদের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেও দিশেহারা করে ছাড়বে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রিয়াকারীর এ প্রকারটি সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত যে, মানুষ দরবেশ ও বুযুর্গদের আকৃতি ও বেশ ধারণ করে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত মুখে নরম ও মিষ্টি কথা বলে সরলপ্রাণ লোকদেরকে নিজের ভক্তির জালে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায় এবং এভাবে দুনিয়া উপার্জনের কৌশল খাটায়। এসব লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়াতেই তারা কঠিন পরীক্ষা ও ফেতনার সম্মুখীন হবে।

রিয়াকার আবেদ ও আলেমদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি

(٢٦٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ ؟ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةَ مَرَّةٍ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا ؟ قَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِاَعْمَالِهِمْ * (رواه الترمذى)

২৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা "দুঃখের কূপ" থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, দুঃখের কূপ কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা জাহান্নামের একটা প্রান্তর অথবা পরিখা। (যার অবস্থা এতই খারাপ যে,) স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশ' বার এর থেকে পানাহ চায়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে কারা প্রবেশ করবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঐসব এবাদতকারী অথবা কুরআন পাঠকারী, যারা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নেক আমল করে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ জাহান্নামের এ "দুঃখ কূপে" যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কুররা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বেশী এবাদতকারীও হতে পারে এবং কুরআনের এলেম ও কুরআন পাঠে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকও হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম এই যে, জাহান্নামের এ বিশেষ কূপ ও পরিখায় তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা দৃশ্যতঃ উঁচুস্তরের দ্বীনদার, কুরআনের এলমের সম্পদে সম্পদশালী এবং বড়ই এবাদতকারী। কিন্তু বাস্তবে এবং অভ্যন্তর বিবেচনায় তাদের এ সকল দ্বীনদারী ও এবাদত-বন্দেগী হবে রিয়াসুলভ।

কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে রিয়াকারদের বিচার হবে

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ

فِيْهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِيَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِيَ فِى النَّارِ * (رواه مسلم)

২৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিরুদ্ধে (জাহান্নামে নিক্ষেপের) ফায়সালা করা হবে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে (জেহাদের ময়দানে) শহীদ হয়েছিল। তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, এগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও আল্লাহ্-প্রদত্ত সকল নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ বল তো! তুমি এসব নেয়ামত পেয়ে কি কাজ করেছিলে ? সে বলবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। (এভাবে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু আমার জীবনকে তোমার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছি।) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এ উদ্দেশ্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলে, যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেকজন হবে ঐ ব্যক্তি, যে এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছিল এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআনও খুব ভালভাবে পড়েছিল। তাকেও আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও সব স্বীকার করে নেবে। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এগুলোর দ্বারা কি কাজ নিয়েছিলে ? সে বলবে, আমি এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছি এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআনও পড়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এলমে দ্বীন এ জন্য শিক্ষা করেছিলে এবং কুরআন এ জন্য পড়েছিলে, যাতে তোমাকে আলেম ও কারী বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয়জন হবে ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মাল-সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও এগুলোর কথা স্বীকার করে নেবে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এগুলো দিয়ে কি কাজ করেছ ? সে উত্তর দেবে, এমন কোন খাত নেই, যেখানে অর্থ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর; কিন্তু আমি সেখানে তোমার জন্য খরচ করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এ কাজ শুধু এজন্য করেছিলে, যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর

তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহু আকবার! কি ভয়ংকর পরিণতির কথা বলা হয়েছে এ হাদীসে! এটা শুনে কার অন্তরাত্মা কেঁপে না উঠবে ? এ জন্যই এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো কখনো বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হলে তিনি খুবই কাঁদলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন।

এ হাদীসে যে তিনটি আমলের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান, কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ্‌র রাহে জীবন ও সম্পদের কুরবানী— এ তিনটি কাজই উঁচু স্তরের পুণ্যকাজ। যদি এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে এ কাজগুলো করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রতিদান হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম। কিন্তু এ কাজগুলোই যখন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং খ্যাতি লাভের আশায় অথবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট এগুলো এমন পর্যায়ের গুনাহ্ ও পাপ যে, অন্য পাপীদের পূর্বেই এসব পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেওয়া হবে এবং এরাই সবার আগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

নেক আমলের কারণে মানুষের কাছে সুনাম হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র একটি নেয়ামত

(٢٦٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ -- وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ --قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ *

(رواه مسلم)

২৬২। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন নেক আমল করে এবং লোকজন এ কারণে তার প্রশংসা করে— অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে যে, লোকজন এ কারণে তাকে ভালবাসে। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা হচ্ছে মু'মিন বান্দার নগদ সুসংবাদ। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত বাণীসমূহ সাহাবায়ে কেরামকে এমন শংকিত করে ফেলেছিল যে, তাদের কারো কারো অন্তরে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল যে, যে নেক আমলের কারণে দুনিয়ার মানুষ আমলকারীর প্রশংসা করে এবং তার নেক আমলের আলোচনা হয়, আর লোকজন তাকে আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মনে করে তাকে ভালবাসতে শুরু করে, হয়তো ঐ নেক আমলও আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। কেননা, এ আমলকারী তো দুনিয়াতেই সুনাম ও ভালবাসার পুরস্কার লাভ করে নিল। এ ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার উত্তরে তিনি বলেছেন ঃ "এটা হচ্ছে মু'মিন বান্দার নগদ সুসংবাদ।" এর মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির নেক আমলের সুখ্যাতি হয়ে যাওয়া অথবা লোকজনের তার প্রশংসা করা অথবা

তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া কোন খারাপ বিষয় নয়; বরং এ ক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে, এটাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আখেরাতে প্রাপ্ত আসল পুরস্কারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই একটি নগদ পুরস্কার এবং এ বান্দার মকবূলিয়্যাত তথা প্রিয়পাত্র হওয়ার একটি সুসংবাদ অগ্রিম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) একদিন নিজের ঘরে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসল এবং সে তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার এ কারণে খুব আনন্দ হল যে, এ ব্যক্তি আমাকে নামাযের মত একটি নেক আমলে লিপ্ত দেখতে পেয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করলেন। (যাতে আল্লাহ্ না করুন, এটাও যদি রিয়ার কোন শাখা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তওবা-এস্তেগফার করে নেবেন।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, এটা রিয়া নয়; বরং তুমি এ অবস্থায় নির্জনে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে এবং লোকসমক্ষে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যেসব নেক আমল কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করা হয়; কিন্তু আমলকারীর ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্‌র বান্দারা এটা জেনে ফেলে এবং এর দ্বারা আমলকারীর মন আনন্দিত হয়, এমতাবস্থায় এটা এখলাছের পরিপন্থী নয়।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক আমল এ উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে করে যে, অন্যরাও তার অনুসরণ করবে এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাহলে এটাও রিয়া হবে না; বরং এ অবস্থায় এ বান্দা অন্যকে নেক আমল শিক্ষা দেওয়ার এবং দ্বীন প্রচারের সওয়াব পাবে। অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আমল ও কাজে এ উদ্দেশ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হত।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে খাঁটি এখলাছ দান করুন, তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা বানিয়ে দিন এবং রিয়া ও আত্মপ্রচারের মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের অন্তরকে হেফাযত করুন। আমীন!

২য় খন্ড সমাপ্ত